POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلْ لِّلّٰهِ ؕ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ؕ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ (الانعام:13)

তুমি বল, ১‘আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে ঐ সকল কাহার? ’তুমিই বল, ‘আল্লাহ্‌রই।’ রহমতকে তিনি নিজের উপর অবধারিত করিয়া লইয়াছেন। নিশ্চয় তিনি তোমাদিগকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত একত্রিত করিয়া যাইতে থাকিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাহারা নিজদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে তাহারাই ঈমান আনিবে না।

(আল আনআম: ১৩

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 3

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 20 জানুয়ারী, 2022 16 জামাদিউস সানি 1443 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা’লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

অসুস্থ ব্যক্তি বাহনে পড়ে তোয়াফ করবে।

১৬৩২) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বায়তুল্লাহ্ তোয়াফ করছিলেন আর তিনি উটের উপর আরোহিত ছিলেন। তিনি (সা.) যখন হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) -এর সামনে আসতেন, তখন তিনি নিজের হাতে থাকা একটি বস্তু দ্বারা সেটির দিকে ইঙ্গিত করতেন আর আল্লাহু আকবার উচ্চারণ করতেন।

১৬৩৩) হযরত উম্মে সালমা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত আছে যে, ‘আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.)কে নিজের অসুস্থতার কথা জানালে তিনি বললেন, উটে চেপে লোকেদের পিছনে থেকে তওয়াফ কর। আমি তওয়াফ করলাম আর রসুলুল্লাহ্ (সা.) বায়তুল্লাহ্‌র এক পাশে নামায পড়ছিলেন। তিনি সূরা ‘ওয়াতুরে ওয়া কিতাবিম মাসতুর’ তিলাওয়াত করছিলেন।

হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদিন ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব (রা.) বলেন:১৬৩২ নম্বর হাদীসে অসুস্থতার কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু আবু দাউদ (রা.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে যে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন সেখানে এই শব্দ রয়েছে-

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدِمَ مَكَّةَ وَهُوَ يَشْتَكِيْ فَطَافَ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ

অর্থাৎ রসুলুল্লাহ্ (সা.) অসুস্থ অবস্থায় মক্কা আসেন। তাই তিনি উটে চড়ে তওয়াফ করেন। দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে আসা কোন ব্যক্তি যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে ইসলামী শরিয়ত তার জন্য সহজসাধ্যতা রেখেছে, তাকে হজ্জের পুণ্য থেকে বঞ্চিত রাখা হয় নি। এমন ব্যক্তি বাহনে চড়ে তওয়াফ করতে পারে।

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল হজ্জ, কাদিয়ান থেকে মুদ্রিত)

যারা আল্লাহ্ তা’লার সন্তুষ্টিতে তুষ্ট থাকে এবং তাঁর বিধি-বিধানকে শিরোধার্য করে, তারা উন্মুক্ত হৃদয়ে اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ উচ্চারণ করে। কোন প্রকারের অভিযোগ অনুযোগ তাদের থাকে না। এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা’লা বলেন- اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ অর্থাৎ এরাই সেই সব মানুষ যাদের ভাগ্যে খোদা তা’লার বিশেষ অনুকম্পা লাভ হয়।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

দেখা গেছে যে কিছু মানুষ পরীক্ষায় নিপতিত হলে সংযম হারিয়ে ফেলে, খোদা তা’লাকে দোষারোপ করতে শুরু করে। তারা বিমর্ষ হয়ে পড়ে কেননা, খোদা তা’লার সঙ্গে যে মধুর সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়, সেটা তাদের থাকে না। খোদা তা’লার সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত সুসম্পর্ক থাকতে পারে যতক্ষণ তাঁর কথা মান্য করা হয়। একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, খোদা তা’লার সঙ্গে সম্পর্ক পরস্পর বন্ধুর ন্যায়- কখনও এক বন্ধু অপর অপর বন্ধুর কথা শোনে, আবার কখনও তাঁকে বন্ধুর কথা মেনে নিতে হয়। আর এই মেনে নেওয়া সানন্দে ও উন্মুক্ত মনে হয়ে থাকে, বাধ্য হয়ে নয়।

খোদা তা’লা এক স্থানে বলেন وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ (আল বাকারা: ১৫৬) অর্থাৎ আমরা পরীক্ষা করতে থাকব কখন ভয়ভীতি দ্বারা, কখনও ক্ষিদে দ্বারা, কখনও সম্পদ ও ফসলাদির ক্ষয়ক্ষতির দ্বারা। ফসলাদির মধ্যে সন্তান-সন্ততিও রয়েছে। আর এর দ্বারা পরীক্ষা হয় যে, কেউ অনেক পরিশ্রম করে ফসল ফলাল আর হঠাৎ তা আগুন লেগে ধ্বংস হয়ে গেল। কিম্বা অন্য কোন বিষয়ে পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা করল আর সেই পরিশ্রম বিফলে গেল। মোটকথা মানুষ বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা ও বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হয়। এগুলি সবই খোদা তা’লার পক্ষ থেকে পরীক্ষা হিসেবে এসে থাকে। এমতাবস্থায় যারা আল্লাহ্ তা’লার সন্তুষ্টিতে তুষ্ট থাকে এবং তাঁর বিধি-বিধানকে শিরোধার্য করে, তারা উন্মুক্ত হৃদয়ে اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ উচ্চারণ করে। (আল বাকারা: ১৫৭) কোন প্রকারের অভিযোগ অনুযোগ তাদের থাকে না। এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা’লা বলেন- اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ অর্থাৎ এরাই সেই সব মানুষ যাদের ভাগ্যে খোদা তা’লার বিশেষ অনুকম্পা লাভ হয়। আল্লাহ তা’লা এই সব মানুষদেরকেই বিপদের সময় পরিত্রাণের পথ দেখান। স্মরণ রেখো, আল্লাহ্ তা’লা যারপরনায় কৃপালু ও দয়ালু। যখন কেউ তাঁর সন্তুষ্টিকে অগ্রগণ্য করে এবং তাঁর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট হয়,তখন তিনি তাকে তাকে অবশ্যই তার প্রতিদান দেন। বস্তুত, এটি সেই মর্যাদা, যেখানে তিনি চান বান্দা তাঁর কথা মান্য করুক। দ্বিতীয় পর্যায়টি হল اُدْعُوْنِيْۤ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (আল মোমেন:৬১) এখানে তিনি বান্দার কথা শোনার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। অতএব, শহীদ এই প্রথম পর্যায়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অর্থাৎ উন্মুক্ত হৃদয়ে তাঁর কথা শোনে, তখন সে বন্ধুর কারণে পাওয়া যন্ত্রণাকে পুরস্কার হিসেবে দেখে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ:৩৪৮)

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আল্লাহ্ তা’লার প্রতি ভালবাসার প্রেরণা বিদ্যমান, কিন্তু আধ্যাত্মিক খাদ্য লাভকারী ব্যক্তির চিন্তাশক্তি ঐশী জ্যোতি লাভ করে, অন্যজন তা থেকে বঞ্চিত থাকে।

يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা নহল-এর উপরোক্ত ১৮ নং আয়াত এর ব্যাখ্যায় বলেন- আয়াতের অর্থ হল যে সৃষ্টি করেছে সে কি সেই তার মত হতে পারে যে সৃষ্টি করে নি? এতে কিছু মানুষ তুলেছে যে, এরকম বলা উচিত ছিল যে, যে সৃষ্টি করে না, সে কি সেই সত্তার মত হতে পারে যে সৃষ্টি করে? কেননা তুলনা করার সময় নিকৃষ্টকে উৎকৃষ্টের তুলনায় উপস্থাপন করা হয়, উৎকৃষ্টকে নিকৃষ্টের তুলনায় রাখা হয় না। শক্তির কথা প্রকাশ করার সময় একথা নিশ্চয় বলতে পারি যে, শিশু কি কখনও যোদ্ধার ন্যায় হতে পারে? কিন্তু কখনও একথা বলতে পারি না যোদ্ধা কি কখনও শিশুর ন্যায় হতে পারে? এই আপত্তি একেবারে সঠিক। এই আয়াতে যদি শক্তিমত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো অভিপ্রেত হত, তবে অবশ্যই এটাই বলা হত যে, যে- সৃষ্টি করে না, সে কি

এরপর ১০ পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

বি:দ্র:- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

এরপর সেই বিশেষ পরিস্থিতি দূর হতেই যখন দেশীয় আইন-কানুন নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করল, যেমনটি আজকের প্রচলিত ব্যবস্থা রয়েছে, তখন সেই সব মহিলা ও বন্দিদেরকে আটক করে রাখার কোন যুক্তিও ছিল না। এখন ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে দাসী বা দাস রাখার কোন বৈধতা নেই। বরং ন্যায়বিচারক ও মীমাংসাকারী হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বর্তমান পরিস্থিতিতে এই প্রথাকে নিষিদ্ধ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

তালাকের শর্ত হল এই যে, যখন কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে তালাক দেয়, তখন সেই তালাক মৌখিক হোক বা লিখিত, উভয় ক্ষেত্রেই কার্যকর হবে।

অনুরূপভাবে একবার মৌখিকভাবে উচ্চারিত তালাকও তালাক হিসেবেই গণ্য হবে। তবে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তা প্রত্যাহার করে নেওয়ার অধিকার স্বামীর আছে, যদি তা তৃতীয় তালাক না হয়। কেননা তৃতীয় তালাকের পর নির্দিষ্ট সময়ের পর প্রত্যাহারও সম্ভব নয় আর ইদ্দতের পর নতুনভাবেও নিকাহ সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত 'হাত্তা তানকেহা জাওজান গায়রাহু'-র শর্ত পূর্ণ হয়। অর্থাৎ সেই স্ত্রী অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে নিকাহ করবে এবং দাম্পত্য সম্পর্কের পর সেখানে কোন পরিকল্পনা ছাড়াই তালাক বা খোলার মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটে বা স্বামীর মৃত্যু হয়, সেক্ষেত্রে সেই মহিলা পূর্বের স্বামীকে নিকাহ করতে পারে।

তবে এক সময়ে একত্রে তিনবার উচ্চারিত তালাক কেবল একটি তালাক হিসেবে গণ্য হবে। হাদীসের গ্রন্থসমূহে হযরত রুকানা বিন আব্দুল ইয়াযিদ (রা.)-এর ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়, যিনি তাঁর স্ত্রীকে একত্রে তিনটি তালাক দিয়েছিলেন, পরে যা নিয়ে তিনি অনুতাপ করেছিলেন। আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে বিষয়টি যখন পৌঁছল, তখন তিনি বললেন, এভাবে একটি তালাক হয়। তুমি চাইলে প্রত্যাবর্তন করতে পার। সুতরাং তিনি তালাক থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। পুনরায় তিনি সেই স্ত্রীকে হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে দ্বিতীয় তালাক ও হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে তৃতীয় তালাক দেন।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, বিদায়াত মুসনাদ আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস, হাদীস-২২৬৬)

প্রশ্ন: এক ভদ্রলোক অ-আহমদী ব্যক্তির জানাযা নামায পড়ার বিষয়ে জামাতের অবস্থান কি? ব্যাংকের সঙ্গে বিভিন্ন আর্থিক লেনদেনের বিষয়েও তিনি প্রশ্ন করেন।

হুযুর আনোয়ার ২০২০ সালের ১৪ই জানুয়ারী তারিখের চিঠিতে লেখেন- অ-আহমদীদের জানাযা নামায পড়ার বিষয়ে জামাতের অবস্থান হল এই যে, যে-ব্যক্তি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করত, তার জানাযা পড়া কোনওভাবেই যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি হুযুর (আ.)=এর দাবিসমূহকে প্রত্যাখ্যানও করে নি, আবার সেগুলির সত্যায়নও করে নি আর এমন ব্যক্তির জানাযা পড়ার জন্য যদি আরও সব লোকেরা উপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে আহমদীদের তার জানাযার নামায থেকে বিরত থাকা উচিত। কিন্তু যদি কোথাও কোনও মুসলমান মারা যায় আর তার জানায পড়ার কোন লোক না থাকে, তবে আহমদী ইমামের নেতৃত্বে আহমদীরা জানাযার নামায পড়বে। কেননা, কলেমা পাঠকারী ব্যক্তি জানাযার নামায ছাড়া কবরস্থ হওয়া উচিত নয়।

বেসরকারি ব্যাংক বা আর্থিক সংস্থার সঙ্গে লেনদেনের ক্ষেত্রে যদি সুদ যুক্ত হয় তবে তা অবৈধ। কিন্তু যদি লেনদেন লাভ ও লোকসানের অংশীদার হওয়ার ভিত্তিতে হয় তবে তা বৈধ।

অনুরূপভাবে সরকারি ব্যাংক বা সরকারি আর্থিক সংস্থায় জমাকৃত অর্থের উপর পাওয়া অতিরিক্ত অর্থ সুদ হিসেবে গণ্য হয় না। কেননা সরকারি ব্যাংক এবং আর্থিক সংস্থা তাদের পুঁজি জনকল্যাণমূলক কাজে বিনিয়োগ করে, যার পরিণামে দেশের মানুষের স্বার্থে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গৃহীত হয়, আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটে এবং দেশের মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হয়। এই কারণে এমন ব্যাংক এবং আর্থিক সংস্থা থেকে পাওয়া লভ্যাংশকে ব্যক্তিগতকাজে লাগানো যেতে পারে। এতে কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন: এক ভদ্রমহিলার হুযুর আনোয়ারকে লেখেন যে, হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁর জুমার খুতবায় বলেছেন , "একজন প্রকৃত মোমেনের উচিত নিজ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির জন্য জন্যও দোয়া করা। কেননা হযরত আদম (আ.) একজন মহিলার কারণে প্রথম অশান্তির মধ্যে পড়েছেন। " কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর রচনাবলীতে উল্লেখ করেছেন যে, বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে যে, 'হাওয়া' হযরত আদমকে বিপথগামিতার দিকে নিয়ে গিয়েছিল। হুযুর আনোয়ার ২০২০ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখের চিঠিতে লেখেন, 'আপনি আমার যে খুতবার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সেখানেও আমি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি পাঠ করেছি। সেই উদ্ধৃতিতে হুযর (আ.) একথাই বর্ণনা করেছেন যে তওরাত অনুসারে হযরত মূসা (আ.)-এর মোকাবেলায় বালাম-এর ঈমান নষ্ট হওয়ার কারণও তার স্ত্রীই ছিল, যাকে বাদশাহ কিছু অলংকারের প্রলোভন দেখিয়েছিল এবং সে বালআমকে হযরত মূসার বিরুদ্ধে বদ দোয়া করতে প্ররোচিত করেছিল। আর এই কারণেই বালাআমের ঈমান নষ্ট হয়েছিল।

এছাড়াও হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর কতিপয় রচনাবলীতে কুরআন করীমের উদ্ধৃতি দিয়ে এই বিষয়টিও বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আদম ইচ্ছাকৃতভাবে আমার নির্দেশ অমান্য করে নি। বরং তাঁর প্রতীতি জন্মেছিল যে, হাওয়া যে ফলটি খেয়েছে এবং আমাকে দিয়েছে, খোদা তা'লা হয়তো সেটির অনুমতি দিয়েছেন, যে কারণে সে এমনটি করেছে। এই কারণেই খোদা তা'লা স্বীয় কিতাবে হাওয়াকে দায়মুক্ত ঘোষণা করেন নি। কিন্তু আদমকে দায়মুক্ত ঘোষণা করেছেন এবং তার সম্পর্কে বলেছেন- 'লাম নাজেদ লাহু আযমান' এবং হাওয়াকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেছেন।

অনুরূপভাবে এক স্থানে হুযুর (আ.) এই বিষয়টিও বর্ণনা করেছেন যে, যেভাবে ৬ষ্ঠ দিনের শেষভাগে আদম সৃষ্টি হয়, অনুরূপভাবে ৬ষ্ঠ হাজারের শেষভাগে হযরত মসীহ মওউদের জন্ম হওয়া অবধারিত ছিল। এবং যেভাবে আদম 'নাহহাশ' দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছিলেন, যাকে আরবীতে 'খান্নাস' বলা হয়, যার অপর নাম দাজ্জাল। অনুরূপভাবে এই শেষ আদমের মোকাবেলায় 'নাহহাশ ' সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে সে লোভী স্বভাবের মানুষদের অমর জীবনের প্রলোভন দেয়। যেমনটি হাওয়াকে সেই সাপ প্রলোভন দিয়েছিল তওরাতে যার নাম রাখা হয়েছে নাহহাশ এবং কুরআনে খান্নাস।

এই বিষয়টি বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণিত হোক বা কুরআনের নির্দেশের আলোকে, বস্তুত এতে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের স্বভাবজাত দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কাজেই যেখানে এ ক্ষেত্রে মহিলাদের এই চারিত্রিক দুর্বলতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে তাদের মধ্যে লোভ-লিপ্সার বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তেমনি রয়েছে পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করার এবং ছলনা দিয়ে তাদেরকে প্ররোচিত করার এবং নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করার দক্ষতা। অনুরূপভাবে পুরুষ একদিকে যেমন নিজেদেরকে ভীষন চালাক ও বুদ্ধিমান মনে করে, তেমনি তাদের মধ্যে এই দুর্বলতাও রয়েছে যে, তারা খুব সহজেই মেয়েদের কথা মেনে নেয়। এই কথাটি আঁ হযরত (সা.) বর্ণনা করেছেন- যেমনিট তিনি বলেন-

مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ

অর্থাৎ হে নারীসমাজ! ধর্ম এবং বিচার বুদ্ধি তুলনায় কম হওয়া সত্ত্বেও আমি তোমাদের থেকে উত্তম কোন জিনিস দেখি নি, যারা বড় বড় বিদ্বান এবং দৃঢ় সংকল্পের পুরুষদের বিচার বুদ্ধি কেড়ে নেয়। (সহী বুখারী)

অতীতে কিছু সংগঠন নারী চরিত্রের এই দুর্বলতা তথা দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করে এসেছে, আর আজকের এই উন্নত যুগেও বড় বড় দেশগুলির অধিকাংশ গোয়েন্দা সংগঠনগুলি তাদের দ্বারা কাজ হাসিল করছে। তাই আমরা দেখতে পাই যে এই সংগঠনগুলিতে অনেক মহিলাকে কেবল এজন্য রাখা হয় যে তারা পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং নিজেদের ধূর্ততার দ্বারা বিভিন্ন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের পুরুষদের থেকে গোপন তথ্য হাতিয়ে নেয় আর একাজে তারা সফলও বটে।

কাজেই এই বিষয়গুলির সম্পর্ক পুরুষ ও মহিলার ইহজাগতিক জীবনের সঙ্গে, কিন্তু সেই সঙ্গে ইসলাম এই শিক্ষাও দিয়েছে যে অধিকার ও কর্তব্যের বিষেয়ে এবং পুণ্য সম্পাদনে পুণ্য লাভের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলার মাঝে কোন তারতম্য নেই। অতএব যেভাবে পুরুষদের ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুসারে তার কিছু অধিকার ও দায়িত্ব রয়েছে, অনুরূপভাবে মহিলাদের অধিকার ও যোগ্যতা অনুসারে তাদের অধিকার ও দায়িত্ব রয়েছে। সেই সব অধিকার ও দায়িত্বাবলীর বিষয়ে কোন তারতম্য নেই। এটি ইসলামের সেই অনিন্দ সুন্দর শিক্ষা যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা কখনই পৃথিবীর কোন ধর্ম বা কোন শিক্ষা করতে পারবে না।

প্রশ্ন: ২০১২ সালের জুলাই মাসে কানাডায় অনুষ্ঠিত গুলশানে ওয়াকফে নও নাসেরাতের অনুষ্ঠানে এক কিশোরী প্রশ্ন করে যে, একবার আমি মিনা বাজারে দেখেছি মেহেন্দীর স্টলে একটি সাইনবোর্ড লাগানো আছে যাতে লেখা ছিল যে ফেসপেন্ট করা হয় আর ট্যাটুও আঁকা হয়। এটা কি ইসলামে বৈধ? হুযুর আনোয়ার বলেন:

যারা ট্যাটু ও ফেসপেন্ট করে, তারা ভুল করে, মেহেন্দীর স্টলে কেবল মেহেন্দি থাকা উচিত। যদি লাজনার সদর এই ধরণের স্টল রেখে থাকে, তবে তা স্পষ্ট অন্যায় হয়েছে। মুখেও মেহেন্দি লাগাও, পাগল সাজিয়ে দাও, কার্টুন বানিয়ে দাও!

জুমআর খুতবা

আল্লাহ্‌র কসম! তিনি ইসলামের জন্য দ্বিতীয় আদম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মুহাম্মদ (সা.)-এর জ্যোতির প্রথম বিকাশ ছিলেন'।

[হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]

সত্য কথা হলো, সকল যুগে যে ব্যক্তি সিদ্দীকের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চায় তার জন্য আবশ্যক আবু বকর (রা.)-এর বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি নিজের মাঝে ধারণ করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা আর এরপর যতটা সম্ভব দোয়া করা। [হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী দ্বিতীয় খলীফায়ে রাশেদ সিদ্দীকে আকবার হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে **প্রদত্ত** ৩ ডিসেম্বর, ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (৩ ফাতাহ, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্‌হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজ হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর স্মৃতিচারণ শুরু হবে। হযরত আবু বকর (রা.)-এর নাম ছিল আব্দুল্লাহ্ এবং তাঁর পিতার নাম ছিল উসমান বিন আমের। তাঁর উপনাম ছিল আবু বকর এবং তাঁর উপাধি ছিল আতীক ও সিদ্দীক। কথিত আছে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন আমুল ফীল বা হস্তি বাহিনী'র আক্রমনের ঘটনার আড়াই বছর পর অর্থাৎ, ৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে। আমি পূর্বেই বলেছি, হযরত আবু বকর (রা.) -এর নাম ছিল আব্দুল্লাহ্। তিনি কুরাইশের বনূ তায়েম বিন মুর্‌রাহ্ গোত্রের সদস্য ছিলেন। অজ্ঞতার যুগে তাঁর নাম ছিল আব্দুল কা'বা কিন্তু মহানবী (সা.) তাঁর নাম পরিবর্তন করে রেখেছিলেন আব্দুল্লাহ্। তাঁর পিতার নাম ছিল, উসমান বিন আমের এবং তাঁর উপনাম ছিল আবু কোহাফা এবং তাঁর মায়ের নাম ছিল সালমা বিনতে সাখ্‌র বিন আমের এবং তার উপনাম ছিল উম্মুল খায়র। এক উক্তি মোতাবেক তাঁর মায়ের নাম ছিল, লায়লা বিনতে সাখ্‌র।

(আল ইসতিয়াব ফি মারেফাতিল আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯১-৯২) (আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯০) (উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২০৪) (আসাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৪৫)

হযরত আবু বকর (রা.)-এর বংশবৃক্ষ সপ্তম পূর্বপুরুষে মুর্‌রাহ্'তে গিয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে মিলিত হয়।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দিক, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ৫৭)

এমনিভাবে হযরত আবু বকর (রা.)-এর মায়ের বংশধারা দাদা এবং নানা যুগপৎ উভয় দিক থেকে ষষ্ঠ পূর্বপুরুষে গিয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে মিশেছে।

(সৈয়্যনাদা আবু বাকার কি জিন্দেগী কে সুনহারে ওয়াকেয়াত, প্রণেতা: আব্দুল মালিক মুজাহিদ, পৃ: ২৯)

আবু কোহাফা তথা হযরত আবু বকর (রা.)-এর পিতার স্ত্রী উম্মুল খায়র তাঁর চাচার মেয়ে ছিলেন অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.)-এর মা তাঁর পিতার চাচাত বোন ছিলেন। (আররওজুল উনাফ, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩০)

হযরত আবু বকর (রা.)-এর পিতা-মাতা হযরত আবু বকর (রা.)-এর মৃত্যুর পরও জীবিত ছিলেন আর তাঁরা উভয়ে তাদের পুত্র তথা হযরত আবু বকর (রা.)-এর সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর মৃত্যুর পর প্রথমে তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়।

(উসদুল গাবা, ৭ম খণ্ড, উম্মুল খায়র, পৃ: ৩১৪-৩১৫)

এরপর তাঁর পিতা ১৪ হিজরীতে ৯৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

(আল আসাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪২৪)

হযরত আবু বকর (রা.)-এর পিতা-মাতা উভয়ের ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য হয়। তাঁর পিতার ঈমান আনার ঘটনা অনেকটা এমন, তাঁর পিতা মক্কা বিজয়ের আগ পর্যন্ত ঈমান আনেন নি। ততদিনে তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গিয়েছিল। মক্কা বিজয়ের সময় মহানবী (সা.) যখন কা'বাগৃহে প্রবেশ করেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর পিতাকে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। মহানবী (সা.) তাঁকে দেখে বলেন, আবু বকর! তুমি এই পৌঢ় লোকটিকে বাড়িতেই থাকতে দিতে, আমি স্বয়ং তাঁর কাছে যেতাম! তখন হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! তাঁর আপনার কাছে উপস্থিত হওয়া অধিক যৌক্তিক, তাঁর কাছে আপনার যাওয়া নয়। নিজের পিতাকে হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে বসিয়ে দেন। মহানবী (সা.) তাঁর বুকে হাত বুলিয়ে দেন এবং বলেন, ইসলাম গ্রহণ করুন, আপনি নিরাপত্তার গণ্ডিতে এসে যাবেন। অতএব, আবু কোহাফা তখন ইসলাম গ্রহণ করেন।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা লি ইবনে হিজর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৭৪-৩৭৫, যিকরু উসমান বিন আমির আবু কাহাফা)

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, আবু কোহাফা'কে মক্কা বিজয়ের দিন নিয়ে আসা হলে দেখা যায় তাঁর মাথার চুল ও দাড়ি 'সালামা'র ন্যায় শুভ্র হয়ে গিয়েছিল। বলা হয়ে থাকে, সালামা হলো, পাহাড়ে জন্মানো শুভ্র রং-এর এক ধরণের ফুল (অর্থাৎ কাশফুলের মত)। মোটকথা, একেবারেই সাদা চুল ছিল এবং দাড়িও সাদা ছিল, তখন মহানবী (সা.) বলেন, এটিকে অন্য কোন রঙে পরিবর্তন করে দাও অর্থাৎ, দাড়িতে খেযাব (বা কলপ) লাগিয়ে দাও অথবা অন্য কোন রং করে দাও, সেটিই উত্তম হবে, তবে কালো রং করবে না।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল আদাব, হাদীস-৩৯১১)

তাঁর কথার অর্থ এই নয় যে, কালো রং-এর মাঝে কোন মন্দ কিছু আছে- অর্থ হলো তিনি হয়ত ভেবে থাকবেন যে, বয়সের এ পর্যায়ে একেবারে কালো রং সেই চেহারার সাথে সম্ভবত মানানসই হবে না। যাহোক, তিনি বলেন, কোন রং ব্যবহার করা উচিত অথবা খেযাব (তথা কলপ) লাগানো উচিত।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর মা প্রাথমিক যুগে ইসলামগ্রহণকারীদের একজন ছিলেন। সীরাতে হালবিয়াতে এর উল্লেখ এভাবে রয়েছে যে, মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা যখননিভৃতে ইবাদতের জন্য দ্বারে আরকামে অবস্থান করছিলেন আর যখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র আটত্রিশজন, তখন আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, মসজিদে হারামে চলুন। মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু বকর! আমাদের সংখ্যা অল্প, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) পীড়াপীড়ি করতে থাকেন যতক্ষণ না তিনি (সা.) সকল সাহাবীকে নিয়ে মসজিদে হারামে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সেখানে হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর উপস্থি তিতে সবার সামনে বক্তৃতা করেন। হযরত আবু বকর (রা.) বক্তৃতার মাধ্যমে লোকদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রতি আহ্বান জানান। এ দৃষ্টিকোণ থেকে মহানবী (সা.)-এর পরে তিনিই প্রথম বক্তা যিনি মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বক্তব্য শুনে মুশরিকরা প্রহারের জন্য হযরত আবু বকর (রা.) ও অন্যান্য মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাঁদেরকে প্রচণ্ড মারধর করে। হযরত আবু বকর (রা.)-কে পদতলে পিষ্ট করা হয় এবং তাঁকে বেদম প্রহার করা হয়। উতবা বিন রাবিয়া হযরত আবু বকর (রা.)-কে সেই জুতাগুলি দিয়ে মারছিল যা মোটা চামড়ার তৈরি ছিল। সে জুতা দিয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর মুখে এত বেশি আঘাত করে যে, মুখ ফুলে যাওয়ার কারণে তাঁর নাক চেনা যাচ্ছিল না। অতঃপর বনূ তায়েম গোত্রের লোকেরা ছুটে আসে এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছ থেকে মুশরিকদের তাড়িয়ে দেয়। বনূ তায়েম-এর লোকেরা তাঁকে একটি কাপড়ের ওপর রেখে তাঁর বাড়িয়ে নিয়ে যায়। হযরত আবু বকর

(রা.)-কে এতটাই প্রহার করেছিল যে, তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে তাদের কোন সন্দেহ ছিল না। এরপর বনূ তায়েমের লোকেরা ফিরে আসে এবং মসজিদে অর্থাৎ, খানা কা'বায় প্রবেশ করে বলে, খোদার কসম! আবু বকর যদি মারা যায় তাহলে আমরা অবশ্যই উতবা-কে হত্যা করবো, যে-কিনা সবচেয়ে বেশি মেরেছিল। এরপর তারা হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট ফিরে আসে আর তাঁর পিতা আবু কোহাফা ও বনূ তায়েমবাসী তাঁর সাথে কথা বলার চেষ্টা করে কিন্তু তিনি অচেতন থাকার কারণে কোন উত্তর দিচ্ছিলেন না। একেবারে দিনের শেষাংশে গিয়ে তিনি কথা বলেন আর সর্বপ্র থম জিজ্ঞাসা করেন, মহানবী (সা.) কেমন আছেন? লোকেরা তাঁর কথার উত্তর দেয় নি কিন্তু তিনি বার বার একই প্র শ্নে র পুনরাবৃত্তি করছিলেন। এটি শুনে তাঁর মা বলেন, খোদার কসম! আমি তোমার সাথীর ব্যাপারে কিছু জানি না। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর মাকে বলেন, আপনি হযরত উমর (রা.)-এর বোন উম্মে জামীল বিনতে খাত্তাবএর নিকট যান। উম্মে জামীল (রা.) পূর্বে ই মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু ইসলামগ্রহণের কথা গোপন রাখতেন। আপনি তার কাছে মহানবী (সা.)-এর অবস্থা জিজ্ঞেস করুন। অতএব, তিনি অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.)-এর মা– উম্মে জামীল (রা.)-এর নিকট যান এবং তাকে বলেন, আবু বকর মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ (সা.)-এর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছে। একথা শুনে তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ-কেও চিনি না আর আবু বকরকেও না। অতঃপর উম্মে জামীল হযরত আবু বকর (রা.)-এর মাকে বলেন, আপনি কি চান যে, আমি আপনার সাথে যাই? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি অর্থাৎ উম্মে জামীল তার সাথে আবু বকর (রা.)-এর কাছে আসেন। তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে চিৎকার দিয়ে ওঠেন আর বলেন, যারা আপনার এ অবস্থা করেছে নিশ্চয়ই তারা দৃষ্কৃতকারী। আর আমি আশা রাখি, আল্লাহ্ তা'লা তাদের কাছ থেকে প্র তিশোধ নিবেন। তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, মহানবী (সা.) কেমন আছেন? উম্মে জামীল বলেন, আপনার মা-ও একথা শুনছেন। তখন তিনি (রা.) বলেন, তিনি তোমার গোপন সংবাদ প্রকাশ করবেন না। এটি শুনে উম্মে জামীল বলেন, মহানবী (সা.) কুশলেই আছেন। হযরত আবু বকর (রা.) জিজ্ঞেস করেন, 'তিনি (সা.) এখন কোথায়?' উম্মে জামীল বলেন, 'দ্বারে আরকামে'। হযরত আবু বকর (রা.)-এর রসূল প্রেমের অসাধারণ মান প্রত্যক্ষ করুন। এ কথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, 'খোদার কসম! আমি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থি ত হবার পূর্বে খাবার স্পর্শ করবো না আর পানিও পান করবো না। হযরত আবু বকর (রা.)-এর মা বলেন, 'আমরা তাঁকে অর্থাৎ আবু বকরকে কিছুক্ষণ আগলে রাখি। বাহিরে লোকদের আনাগোনা কমে যায় আর লোকেরা নীরব হয়ে যায় তখন আমরা তাঁকে নিয়ে বের হই। তিনি আমার ওপর ভরকরে হাঁটতে হাঁটতে মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছে যান। তখন হযরত আবু বকর (রা.) গভীরভাবে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। মহানবী (সা.) যখন হযরত আবু বকর (রা.)-এর এই অবস্থা দেখেন তখন তিনি চুমু দেয়ার জন্য হযরত আবু বকর (রা.)-এর দিকে ঝুঁকেন আর মুসলমানরাও তাই করে। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য নিবেদিত। লোকেরা আমার মুখমণ্ডলে যেসব আঘাত করেছে সেগুলো ছাড়া আমার আর কোন কষ্ট নেই। ইনি আমার মা যিনি নিজ পুত্রের সাথে ভালো ব্যবহার করেন। এ সংক্ষিপ্ত কথাগুলো বলেন। হতে পারে আল্লাহ্ তা'লা আপনার বদৌলতে তাকে আগুণ থেকে রক্ষা করবেন অর্থাৎ, তিনি হয়ত ঈমান আনবেন। তখনমহানবী (সা.) তার মায়ের জন্য দোয়া করেন আর তাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানান। এতে তিনি ইসলাম কবুল করেন।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪১৮-৪১৯)

এভাবে হযরত আবু বকর (রা.)-এর মা শুরুতেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

সাহাবীদের জীবন চরিত সম্পর্কে রচিত একটি নির্ভ রযোগ্য পুস্তক 'এসাবাহ্' অনুসারেহযরত আবু বকর (রা.)-এর জন্ম হয় 'আমুল ফিল' (আবরাহার হস্তিবাহিনীর আক্রমণের) এর দু'বছর ছয় মাস পর।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা,৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৪৫)

তাবারী ও তাবাকাতুল কুবরাতে লেখা হয়েছে, তিনি 'আমুল ফিল' এর তিন বছর পর জন্মগ্রহণ করেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫১) (তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড পৃ: ৩৪৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া)

বলা হয়ে থাকে, হযরত আবু বকর (রা.)-এর দু'টি উপাধি সুপ্রসিদ্ধ। একটি 'আতীক' আরেকটি হলো 'সিদ্দীক'। 'আতীক' উপাধীর দেওয়ার কারণ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর নিকট আসলে তিনি (সা.) বলেন أَنْتَ عَتِيْقُ اللهِ مِنَ النَّارِ । অর্থাৎ, তুমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগুন থেকে মুক্ত। তাই সেদিন থেকে তাকে 'আতীক' উপাধি প্রদান করা হয়। কোন কোন ইতিহাসবিদের মতে 'আতীক' হযরত আবু বকর (রা.)-এর উপাধি নয় বরং নাম ছিল।

(সুনান তিরমিযি, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৬৭৯)

তারা বলেন, এটি উপাধি নয় বরং তাঁর নাম ছিল; কিন্তু এটি সঠিক নয়। আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী 'তারিখুল খু লাফা'তে ইমাম নববী'র বরাতে লিখেছেন, হযরত আবু বকর (রা.)-এর নাম আব্দুল্লাহ্ ছিল আর এটাই বে শি প্রসিদ্ধ এবং সঠিক। এটাও বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর নাম আতীক ছিল। কিন্তু সঠিক সেটিই যা সম্পর্কে অধিকাংশ আলেম একমত। তা হলো আতীক তাঁর উপাধি ছিল নাম নয়।

(তারিখুল খোলাফা, পৃ: ২৭, দারুল কিতাবুল আরাবি, বেরুত, ১৯৯৯)

সীরাত ইবনে হিশাম-এ আতীক উপাধির কারণ এটি বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁর চেহারার সৌন্দর্য এবং তাঁর সৌন্দর্য ও সুষমার কারণে তাঁকে আতীক বলা হতো। (আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ১১৭)

সীরাত ইবনে হিশাম এর ব্যাখ্যায় আতীক উপাধির নিম্নলিখিত কারণসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। আতীক অর্থ, 'আল হাসান' অর্থাৎ, উত্তম গুণাবলীর অধিকারী। অর্থাৎ তাঁকে অসম্মান ও দোষত্রুটি থেকে রক্ষা করা হয়েছে। এটাও বলা হয়ে থাকে যে, তঁ াকে আতীক বলার কারণ হলো, তাঁর মায়ের কোন সন্তান বাঁচতো না। তিনি মানত করেছিলেন, যদি তাঁর গর্ভে সন্তান হয় তাহলে তিনি তাঁর নাম রাখবেন আব্দুল কা'বাআর তাকে কা'বার সেবায় উৎসর্গ করবেন। যখন তিনি জীবিত থাকেন এবং যৌবনে উপনীতহন তখন তাঁর নাম আতীক হয়ে গেল, অর্থাৎ তাঁকে যেন মৃত্যু থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

(আর রওউজুল উনাফ ফি তাফসীরুস সীরাতুন্নাবুয়্যত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩০)

এছাড়াও আতীক উপাধির আরো অনেকগুলো কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। কারো কারো মতে তাঁকে আতীক বলার কারণ হলো, তাঁর বংশে এমন কোন ত্রুটি ছিল না যার কারণে তাঁর ওপর কলঙ্ক লেপন করা যেতে পারে।

(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯৬৩)

আতীক শব্দের আরেকটি অর্থ, প্রাচীন বা পুরোনো। এ দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত আবু বকর (রা.)-কে এজন্যও আতীক বলা হতো যে, অতীতকাল থেকেই তিনি পুণ্য ও সৎকর্ম করতেন।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৪৬)

অনুরূপভাবে ইসলাম গ্রহণ এবং সৎকর্ম সম্পাদনে অগ্রগামী থাকার কারণে তাঁর উপাধি আতীক রাখা হয়েছিল।

(উমদাতুল ক্বারী, কিতাবু বাদউল খালক, খণ্ড-১৬, পৃ: ২৬০)

এছাড়া দ্বিতীয় উপাধি সিদ্দীক রাখার যে কারণ বর্ণনা করা হয় তাহলো, আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী সাহেব লিখেন, সিদ্দীক উপাধির যতটা সম্পর্ক রয়েছে সে সম্পর্কে বলা হয়, অজ্ঞতার যুগে তাঁকে এই উপাধি দেওয়া হয়েছিল সেই সততার জন্য যা তাঁর পক্ষ থেকে প্রকাশ পেত। আরো বলা হয়ে থাকে যে, মহানবী (সা.) তাঁকে যেসব সংবাদ দিতেন সেগুলো সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর দ্রুত সত্যায়নের কারণে তাঁর সিদ্দীক উপাধি প্রসিদ্ধি পায়।

(তারিখুল খোলাফা, প্রণেতা- জালালুদ্দিন সুয়ূতি, পৃ: ২৮-২৯)

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, রাতের বেলা যখন মহানবী (সা.)-কে বায়তুল মাকদাসের মসজিদে আকসায় নিয়ে যাওয়া হয়, (অর্থাৎ ইসরার ঘটনা যখন সংঘটিত হয়) তখন সকালবেলা লোকেরা এ ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের কানাঘুষা করতে থাকে। তিনি (সা.) যখন (এ বিষয়টি) বলেন, তখন লোকদের মধ্যে থেকে যারা ঈমান এনেছিল এবং তাঁকে সত্যায়নও করেছিল তারা পিছিয়ে যায়। এমন কিছু দুর্বল ঈমানের লোকও ছিল। এমন সময় মুশরিকদের মধ্য থেকে কিছু লোক হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট ছুটে এসে বলে, আপনি কি আপনার সঙ্গী সম্পর্কে জানেন, তিনি দাবি করছেন– রাতের বেলা তাঁকে বায়তুল মাকদাসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, সত্যিই কি তিনি (সা.) একথা বলেছেন? লোকেরা বলে, হঁ্যা!। একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তিনি (সা.) যদি একথা বলে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই তা সত্য। লোকেরা বলে, আপনি কি তাঁর (একথার) সত্যায়ন করছেন যে, রাতে তিনি বায়তুল মাকদাসে গিয়েছেন আর সকাল হওয়ার আগেই ফেরত এসে গেছেন। কেননা এই বায়তুল মাকদাস মক্কা থেকে প্রায় তেরোশ' কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থি ত। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হ্যাঁ! আমি এর সত্যায়ন করব বরং এর চেয়ে অসম্ভব বিষয় হলেও আমি সেটিকে সত্য বলে মেনে নিব। এরপর

হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি তো সকাল ও সন্ধ্যায় অবতীর্ণ হওয়া ঐশী সংবাদের ক্ষেত্রেও তাঁর সত্যায়ন করি। অতএব, এজন্য হযরত আবু বকর (রা.)-এর সিদ্দীক উপাধি প্রসিদ্ধি পায় আর তাঁকে সিদ্দীক নামে ডাকা হতে থাকে।

(আল মুসতাদরাক আলাস সালেহীন লিল হাকিম, কিতাবু মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮১) (এটলাস সীরাত নববী পৃ: ১৩৬)

হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.)-এর মুক্ত ক্রীতদাস আবু ওহাব বর্ণনা করেন, মহানবী(সা.) বলেছেন, যে রাতে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়, (অর্থাৎ ইসরার ঘটনায়) সেদিন আমি জিব্রাঈল (আ.)-কে বলি, অবশ্যই আমার জাতি আমাকে সত্যায়ন করবে না, (অর্থাৎ আমার কথা সত্য বলে মেনে নিবে না) তখন জিব্রাঈল বলে, يُصَدِّقُكَ اَبُوْبَكْرٍ وَهُوَ الصِّدِّيْقُ অর্থাৎ আবু বকর আপনার সত্যায়ন করবেন আর তিনি সিদ্দীক। এটি তাবাকাতে কুবরা পুস্তকে লিখা আছে।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১২৭)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণনা হলো, "যখন ইসরার ঘটনা সংঘটিত হয় তখন মানুষ হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট ছুটে আসে এবং তাঁকে বলে, আপনি কি জানেন, আপনার বন্ধু কী বলছেন? তিনি (রা.) জিজ্ঞেস করেন, কী বলছেন? উত্তরে তারা বলে যে, 'তিনি (সা.) বলেন, রাতে আমি বায়তুল মাকদাস থেকে ঘুরে এসেছি'। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, মহানবী (সা.) যদি একই সাথে মে'রাজের কথাও উল্লেখ করতেন, অর্থাৎ একই সময় বলতেন বা একই ঘটনা হতো তাহলে এ অংশের জন্য কাফিররা বেশি চিৎকার-চেঁচামেচি করত। কিন্তু তারা শুধু একথা বলেছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, আমি রাতে বায়তুল মাকদাস পর্যন্ত গিয়েছিলাম। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর সত্যায়ন করলে লোকেরা তাঁকে বলে, আপনি কি এই অযৌক্তিক কথাও বিশ্বাস করবেন? তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি তো তাঁর একথাও বিশ্বাস করি যে, সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর নিকট আকাশ থেকে ঐশীবাণী অবতীর্ণ হয়।"

(তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৮৬)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "মহানবী (সা.) যে, হযরত আবু বকর (রা.)-কে সিদ্দীক উপাধিতে ভূষিত করেছেন সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন যে, তাঁর মাঝে কী কী অনন্য বৈশিষ্ট্য বা পরাকাষ্ঠা ছিল। মহানবী (সা.) আরো বলেছেন, হযরত আবু বকর (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সে-ই জিনিসের জন্য যা তাঁর হৃদয়ে রয়েছে। মনোযোগ দিয়ে দেখলে বুঝা যায়, সত্যিকার অর্থেই হযরত আবু বকর (রা.) যে সততা দেখিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার আর সত্য কথা হলো, সকল যুগে যে ব্যক্তি সিদ্দীকের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চায় তার জন্য আবশ্যক আবু বকর (রা.)-এর বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি নিজের মাঝে ধারণ করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা আর এরপর যতটা সম্ভব দোয়া করা। যতক্ষণ না আবু বকর সুলভ প্রকৃতির ছাপ গ্রহণ করবে এবং সেই রঙে রঙিন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সিদ্দিকী উৎকর্ষ অর্জিত হতে পারে না।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৭২-৩৭৩)

আরো বলা হয়ে থাকে, আতীক ও সিদ্দীক ছাড়াও হযরত আবু বকর (রা.)-এর অন্যান্য উপাধিও ছিল। যেমন- 'খলীফাতু রসূলিল্লাহ্'। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-কে খলীফাতু রসূলিল্লাহ্ও বলা হত। একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে, এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলে, ইয়া খলীফাতাল্লাহে! অর্থাৎ হে আল্লাহর খলীফা! তখন তিনি (রা.)বলেন, খলীফাতুল্লাহ্ নয় বরং খলীফাতু রসূলিল্লাহ্, অর্থাৎ আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খলীফা আর আমি এতেই সন্তুষ্ট।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৩৭)

সহীহ্ বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা বদর উদ্দীন আইনী বর্ণনা করেন, ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত যে, হযরত আবু বকর (রা.)-এর উপাধি খলীফাতু রসূলিল্লাহ্ ছিল।

(উমদাতুল কারি, কিতাবু বাদউল খালক, খণ্ড-১৬, পৃ: ২৬০)

কিন্তু এটি স্পষ্ট যে, মহানবী (সা)-এর মৃত্যুর পর তাঁর খলীফা হওয়ার দরুণহযরত আবু বকর (রা.)-কে এই উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। এজন্য আমরা এটি বলতে পারি না যে, এটি মহানবী (সা.)-এর যুগের উপাধি। এটি পরবর্তী যুগের কথা, এ নামটি মানুষ রেখেছে অথবা তিনিই নিজের জন্য পছন্দ করেছেন।

অপর একটি উপাধি হলো, 'আওয়াহুন'। আওয়াহ্ অর্থ পরম সহিষ্ণু ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী। তাবাকাতে কুবরায় লিখা আছে- হযরত আবু বকর (রা.)-কে তাঁর কোমলতা ও দয়ার্দ্রতার কারণে আওয়াহুন বলা হত।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১২৭)

'আওয়াহুম্ মুনীব' অর্থ হলো, অত্যন্ত সহিষ্ণু ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী এবং বিনত মানুষ। তাবাকাতে কুবরায় আছে, হযরত আলী (রা.)-কে আমি মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, মনোযোগ দিয়ে শোন! হযরত আবু বকর (রা.) অত্যন্ত সহিষ্ণু , কোমল হৃদয়ের অধিকারী ও বিনত একজন মানুষ ছিলেন। মনোযোগ দিয়ে শোন! আল্লাহ্ তা'লা হযরত উমর (রা.)-কে হিতাকাঙ্ক্ষতা প্রদান করেন যার ফলে তিনি হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে গেছেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১২৭)

'আমীরুশ্ শাকিরীন'- এটিও একটি উপাধি। আমীরুশ্ শাকিরীনের অর্থ হলো, কৃতজ্ঞ লোকদের সর্দার বা নেতা। অনেক বেশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য হযরত আবু বকর সিদ্দীক(রা.)-কে আমীরুশ্ শাকিরীন বলা হত। উমদাতুল ক্বারী পুস্তকে লিখা আছে, হযরত আবু বকর (রা.)-কে আমীরুশ্ শাকিরীন উপাধিতে সম্বোধন করা হত।

(উমদাতুল কারি, কিতাবু বাদউল খালক, খণ্ড-১৬, পৃ: ২৬০)

'সানিয়া এস্নাঈন'- এটিও একটি উপাধি। হযরত আবু বকর (রা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা 'সানিয়াস্নাঈন' উপাধিতে সম্বোধন করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার বাণী হলো,

إِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ

অর্থাৎ, 'তোমরা যদি এই রসূলকে সাহায্য নাও কর তবে (জেনে রেখো!) আল্লাহ্ তা'লা পূর্বেও তাঁকে সাহায্য করেছেন, যখন কাফিররা তাঁকে তাঁর দেশ থেকে বের করে দিয়েছিল তখন সে দু'জনের একজন ছিল যখন তাঁরা দু'জনই গুহায় অবস্থান করছিল আর সে তাঁর সঙ্গীকে বলছিল, ভয় পেও না! নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি আপন প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন'।

(সূরা আত্ তওবা: ৪১)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'লা কষ্টের সময় এবং সঙ্কটময় অবস্থায় স্বীয় নবী (সা.)-কে তাঁর মাধ্যমে সান্ত্বনা দিয়েছেন আর আস্ সিদ্দীক নাম এবং দু'জাহানের নবীর নৈকট্যের বিশেষত্ব প্রদান করেছেন। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা তাঁকেই সানিয়াস্নাঈন-এর গৌরবময় পোশাক পরিধান করিয়েছেন এবং স্বীয় বিশেষ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তোমরা এমন কোন ব্যক্তিকে চেন কি যাকে সানিয়াস্নাঈন নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং দু'জাহানের নবীর বন্ধু আখ্যা দেওয়া হয়েছে আর এই শ্রেষ্ঠত্বের অংশীদার করা হয়েছে যে, ***'ইন্নাল্লাহা মাআনা'*** (অর্থাৎ, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন) এবং তাঁকে দু'জন (ঐশী) সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যে একজন আখ্যা দেওয়া হয়েছে? তোমরা কি এমন কোন ব্যক্তিকে চেন যার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এভাবে প্রশংসা করা হয়েছে এবং যার অজানা জীবন হতে হরেক প্রকার সন্দেহ দূর করা হয়েছে আর যার সম্পর্কে কোন ধারণাপ্রসূত সংশয়পূর্ণ কথা দিয়ে নয় বরং পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারা এটি প্রমাণিত যে, তিনি আল্লাহ্ তা'লার দরবারে গৃহীত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত? খোদার কসম! এমন সুস্পষ্ট ঘোষণা যা নিশ্চতরূপে প্রমাণিত তা কেবল হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-রই অনন্য বৈশিষ্ট্য। আমি কা'বা গৃহের প্রভু -প্রতিপালকের পবিত্র গ্রন্থসমূহে অন্য কোন ব্যক্তির জন্য এমনটি দেখি নি। অতএব, আমার এ কথায় তোমার যদি কোন সন্দেহ থাকে কিংবা তোমার এমন ধারণা হয় যে, আমি সত্যের অপলাপ করেছি তবে কুরআন থেকে কোন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন কর এবং আমাদেরকে দেখাও যে, ফুরকানে হামীদ তথা পবিত্র কুরআন অন্য কারো জন্য অনুরূপ কথা বলেছে, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক! (সির্রুল খিলাফাহ্ , উর্দু অনুবাদ, পৃ: ৬০,৬৩,৬৪)

তাঁর আরেকটি উপাধি হলো, 'সাহেবুর্ রসূল'। এর অর্থ হলো রসূলের সঙ্গী। হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি একদল লোককে বলেন- তোমাদের মধ্যে কে (আমাকে)সূরা তওবা পড়ে শোনাবে? একজন বলে, আমি পড়ে শোনাচ্ছি। এরপর সে যখন আয়াত إِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ অর্থাৎ, যখন সে তাঁর সঙ্গীকে বলেছিল, দুঃখিত হয়ো না' তে পৌঁছায় তখন হযরত আবু বকর (রা.) কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমিই তাঁর (সা.) সঙ্গী ছিলাম।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৬)

তাঁর আরেকটি উপাধি হলো, 'আদমে সানী' (দ্বিতীয় আদম)। এটি হযরত আবু বকর (রা.)-এর সেই উপাধি যা হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁকে প্রদান করেন। হযরত আবু বকর (রা.)-কে তিনি

দ্বিতীয় আদম আখ্যা দিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের এক রচনায় বলেন, 'হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামের দ্বিতীয় আদম আর একইভাবে হযরত উমর ফারুক এবং হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুমা যদি ধর্মের ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থেই আমানতদার বা বিশ্বস্ত না হতেন তবে আজ আমাদের জন্য পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কেও এটি বলা কঠিন ছিল যে, তা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে'।

(মাকতুবাতে আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৫১, মকতুব নং-২)

সির্‌রুল খিলাফাহ্ পুস্তকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যা বর্ণনা করেছেন তার অনুবাদ হল, -'এবং আল্লাহ্‌র কসম! তিনি ইসলামের জন্য দ্বিতীয় আদম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মুহাম্মদ (সা.)-এর জ্যোতির প্রথম বিকাশ ছিলেন'।

(সিররুল খিলাফাহ, উর্দু অনুবাদ, পৃ: ৫১-৫২)

তাঁর আরেকটি উপাধি হলো, 'খলীলুর্ রসূল' (রসূলের অন্তরঙ্গ বন্ধু)। জীবনীগ্রন্থগুলোতে হযরত আবু বকর (রা.)-এর একটি উপাধি খলীলুর্ রসূল-ও বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর ভিত্তি হাদীসগ্রন্থগুলোতে বিদ্যমান একটি রেওয়ায়েত। মহানবী (সা.) বলেন, যদি আমি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতাম তবে তা আবু বকরকে বানাতাম। সহীহ্ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) মৃত্যুশয্যায় বলেন, আমি যদি মানুষের মধ্যে থেকে কাউকে অন্ত রঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম তবে হযরত আবু বকরকেই অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, কিন্তু ইসলামের বন্ধুত্বই সর্বোত্তম। এই মসজিদের সবক'টি জানালা আমার পক্ষ থেকে বন্ধ করে দাও, কেবল আবু বকরের জানালা ছাড়া। (সহী বুখারী, কিতাবুস সালাত, হাদীস-৪৬৭)

আমাদের রিসার্চ সেল এখানে একটি প্রশ্নে র অবতারণা করেছে আর তাদের এ প্রশ্ন যৌক্তিকও বটে। তাদের বক্তব্য হলো, এই হাদীস থেকে কেবল একথা প্রমাণ হয় যে, মহানবী (সা.) যদি কাউকে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতেন তবে হযরত আবু বকর (রা.)-কে বানাতেন, কিন্তু তিনি তা বানান নি। এ বিষয়টিকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজেও একস্থানে স্পষ্ট করেছেন। যেমন- হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর উক্তি, 'আমি যদি পৃথিবীতে কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতাম তবে হযরত আবু বকরকেই বানাতাম- বাক্যটিও ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। হযরত আবু বকর (রা.) তো তাঁর বন্ধু ছিলেনই তাহলে একথার অর্থ কী? আসল কথা হলো, হৃদ্যতা ও বন্ধুত্ব মূলত সে সম্পর্ককেই বলে যা রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে আর এমন সম্পর্ক কেবল আল্লাহ্ তা'লারই বিশেষত্ব এবং তাঁরই জন্য নির্ধারিত। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে কেবল ভ্রাতৃত্ব ও সম্পর্কই প্রযোজ্য। খুল্লাত-এর মর্মই হলো, তা একেবারে ভেতরে গ্রথিত হয়ে যায় অর্থাৎ খালাতের উন্নত পর্যায়ের পরিচয় হলো, খুল্লাতের উন্নত মর্যাদা তেমনিই যেমনটি কি-না ইউসুফ জুলেখার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রথিত হয়ে গিয়েছিলো। অতএব, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র বাক্যের এটিই মর্ম যে, আল্লাহ তা'লার ভালোবাসায় তো কেউ অংশিদার হতে পারে না তবে এ পৃথিবীতে যদি কাউকে অন্ত রঙ্গ বন্ধু বানাতাম তাহলে তিনি হলেন, হযরত আবু বকর।" (মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২৭৭)

আল্লাহ্ তা'লার এক স্বতন্ত্র মর্যাদা রয়েছে তাঁর মত মর্যাদা আর কেউই পেতে পারে না কিন্তু পার্থিব বন্ধুত্বের মাঝে যদি কারো সাথে বন্ধুত্ব থেকে থাকে তাহলে তা আবু বকরের সাথে রয়েছে। অর্থাৎ বন্ধুত্ব ছিল একথা ঠিক, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার বন্ধুত্বের বিপরীতে বন্ধুত্ব আছে তা কিন্তু বলা যায় না। পার্থিব মানুষের সাথে আল্লাহ্ তা'লার মত বন্ধুত্ব করা একজন নবীর জন্য বিশেষত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্য সম্ভব ছিল না, হতেই পারে না। তবে জাগতিক দৃষ্টিকোন থেকে যদি কারো সাথে বন্ধুত্ব করা যেতো তবে হযরত আবু বকর (রা.) এ মর্যাদা লাভের সবচেয়ে বেশি যোগ্য ছিলেন।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর উপনাম: হযরত আবু বকর (রা.)-এর ডাকনাম ছিল আবু বকর এবং এই ডাকনামের একাধিক কারণও বর্ণনা করা হয়ে থাকে। কতকের মতে, 'বকর' যুবক উটকে বলা হয়। যেহেতু তিনি উট পালন এবং পরিচর্যার ক্ষেত্রে বিশেষ আগ্রহ ও দক্ষতা রাখতেন সেজন্য মানুষ তঁ াকে 'আবু বকর' নামে ডাকতে আরম্ভ করেন। বাকারাএর একটি অর্থ, জলদি করা বা সর্বাগ্রে করে ফেলাও হয়ে থাকে। কতকের মতে এই উপনামে আখ্যায়িত হওয়ার কারণ হলো, তিনি সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। إِنَّهُ بَكَّرَ إِلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ غَيْرِهِ। তিনি ইসলাম গ্রহণে অন্যদের পূর্বে অগ্রসর হয়েছেন।

(আশারা মুবাশ্বেরা, প্রণেতা বশীর সাজিদ, পৃ: ৪১, আল বদর পাবলিকেশনস, ২০০০)

আল্লামা যামাখ্‌শারী লিখেছেন , তাঁর পবিত্র গুণাবলীর মাঝে 'ইবতেকার' তথা সকল কাজে সর্বাগ্রে থাকার বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁকে আবু বকর নামে আখ্যায়িত করা হতো।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৯০)

হযরত আয়েশা (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর দেহাবয়ব সম্পর্কে বর্ণনা করেন, তিনি এক আরব ব্যক্তিকে দেখেন যে হেঁটে যাচ্ছিল আর হযরত আয়েশা (রা.) সে সময় নিজ হাওদায় বসেছিলেন। তিনি (রা.) বলেন, আমি এই ব্যক্তির চেয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আর কোন মানুষকে দেখি নি। বর্ণনাকারী বলেন, আপনি আমাদের কাছে হযরত আবু বকর (রা.)-এর হুলিয়া বা দেহাবয়ব বর্ণনা করুন, তখন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) ফর্শা ও হ্যাংলা পাতলা ছিলেন, গালে মাংস কম ছিল, কোমর সামান্য আনত ছিল যার ফলে তাঁর লুঙ্গিও কোমরে স্থির থাকতো না বরং নিচের দিকে নেমে যেত। চেহারা ছিল স্বল্প মাংসল, চোখ ভেতরে বসাছিল আর ললাট বা কপাল ছিল সুউচ্চ।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৪০)

সহীহ্ বুখারীতে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অহংকার বশতঃ কাপড় হেঁচড়ে হাঁটবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার দিকে তাকিয়েও দেখবেন না। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, [হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)!] কাপড়ের ব্যাপারে আমি বিশেষ মনোযোগ না দিলে আমার কাপড়ের একাংশ ঝুলে থাকে অর্থাৎ এক পার্শ্ব ঢিলা থাকে যার ফলে তা নিচে নেমে যায়। মহানবী (সা.) বলেন, আপনি তো অহংকার করে এমনটি করেন না। (সহী বুখারী, কিতাবু ফাযাইলির আসহাবুন নবী, হাদীস-৩৬৬৫) এটি বৈধ, কোন সমস্যা নেই'।

হযরত আবু বকর (রা.) মেহেদী ও কাতমের খিযাব লাগাতেন।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাযাইল)

কাতম হলো, এক ধরনের গুল্ম যা উঁচু পাহাড়ে জন্মায়। এটি নীল (গাছের) পাতার সাথে মিশিয়ে লাগানো হয় আর এর মাধ্যমে চুল কালো করা হয়। (লিসানুল আরাব)

ইসলামগ্রহণের পূর্বে হযরত আবু বকর (রা.)-এর পেশা এবং কুরাইশদের মাঝে তাঁর মর্যাদার বিষয়ে তাবারীর ইতিহাসগ্রন্থে লেখা আছে, হযরত আবু বকর (রা.) নিজ জাতিতে অত্যন্ত সম্মানিত ও প্রিয়ভাজন ছিলেন। তিনি নম্র স্বভাবের মানুষ ছিলেন। কুরাই শদের বংশধারা এবং তাদের ভালো ও মন্দ গুণাবলী সম্পর্কে তিনি সবচেয়ে বেশি অবগত ছিলেন। তিনি ব্যবসায়ী মানুষ ছিলেন এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী ও পুণ্যবান ছিলেন। তাঁর জাতির লোকেরা একাধিক বিষয়ের কারণে তাঁর কাছে আসতো এবং তাঁকে ভালোবাসতো। অর্থাৎ তাঁর জ্ঞানের কারণে, তাঁর অভিজ্ঞতার কারণে এবং তাঁর উত্তম বৈঠকে ওঠাবসার কারণে তারা তাঁর কাছে আসতো ও (তাঁকে) ভালোবাসতো।

(তারিখে তাবারী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৪০-৫৪১)

মুহাম্মদ হোসেইন হ্যায়কল লিখেছেন, পুরো কুরাইশ জাতি পেশায় ব্যবসায়ী ছিল এবং তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি এ কাজেই নিয়োজিত ছিল। তদনুরূপ হযরত আবু বকর (রা.)ও বড় হয়ে কাপড়ের ব্যবসা আরম্ভ করেন যাতে তিনি অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেন। খুব শীঘ্রই তিনি মক্কার খুব সফল ব্যবসায়ীদের মধ্যে গণ্য হন। ব্যবসায়িক সাফল্যের পেছনে তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এবং অতুলনীয় চরিত্রেরও বড় ভূমিকা ছিল।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক আকবর, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, অনুবাদক-শেখ মহম্মদ আহমদ পানিপতি, পৃ: ৪১)

মহানবী (স.)-এর নবুয়্যত লাভের সময় তাঁর মূলধন ছিল চল্লিশ হাজার দিরহাম। তিনি এগুলোর মাধ্যমে দাসদের মুক্ত করতেন ও মুসলমানদের দেখাশোনা করতেন। তিনি যখন মদীনায় আসেন তখন তাঁর কাছে কেবল পাঁচ হাজার দিরহাম অবশিষ্ট ছিল।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৪৮)

প্রাক ইসলামিক যুগের কতিপয় ঘটনা রয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর সম্পদের প্রাচুর্য ও উন্নত চরিত্রের জন্য কুরাইশদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি কুরাইশ নেতাদের অন্যতম ছিলেন এবং তাদের পরামর্শসভার মধ্যমণি ছিলেন। তিনি সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন নেতৃস্থানীয়, সম্মানিত ও দানশীল এবং স্বীয় সম্পদ অনেক বেশি ব্যয় করতেন। (তিনি) নিজ জাতিতে সবার নয়নমণি ও প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ভালো লোকদের সঙ্গে উঠাবসা করতেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যায় তিনি লোকদের মধ্যে অধিক পারদর্শী ছিলেন। অর্থাৎ এ বিষয়ে খুব পাণ্ডিত্য রাখতেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যাশাস্ত্রের অনেক বড় আলেম ইবনে সীরীন বলেন, মহানবী (সা.)-এর পর হযরত আবু বকর (রা.) এ উম্মতের সবচেয়ে বড় স্বপ্নবিশারদ ছিলেন এবং তিনি লোকদের মধ্যে আরবদের বংশবৃক্ষ বা বংশ পরিচয় সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞান রাখতেন।

জুবায়ের বিন মুতআ'ম যিনি বংশবৃক্ষ সম্বন্ধীয় জ্ঞানে শীর্ষ পর্যায়ের আলেম ছিলেন তিনি বলেন, আমি বংশবৃক্ষের জ্ঞান হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে শিখেছি। বিশেষভাবে কুরাইশের বংশ পরিচয়। কেননা, হযরত আবু বকর (রা.) কুরাইশদের মধ্যে কুরাইশের বংশ পরিচয় এবং তাদের বংশে যেসব ভালো-মন্দ দিক ছিল সে সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাদের মন্দ দিকগুলো উল্লেখ করতেন না। একারণেই তিনি হযরত আকীল বিন আবু তালেবের চাইতে তাদের মধ্যে অধিক গ্রহণীয় ছিলেন। হযরত আকীল হযরত আবু বকর (রা.)-এর পর কুরাইশদের বংশ পরিচয় এবং তাদের পূর্ব পুরুষ ও তাদের ভালো-মন্দ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞান রাখতেন। কিন্তু কুরাইশরা হযরত আকীলকে পছন্দ করতো না কেননা, তিনি কুরাইশদের মন্দ দিকগুলোও তুলে ধরতেন। হযরত আকীল আরবের বংশ পরিচয় ও তাদের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানার্জনেরজন্য মসজিদে নববীতে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাহচর্যে বসতেন।

মক্কাবাসীদের নিকট হযরত আবু বকর (রা.) তাদের মধ্যে উত্তম লোকদের অন্যতম ছিলেন। এজন্য যখনই তারা কোন বিপদে পড়ত তখন তারা তাঁর কাছে সাহায্য চাইত। (আসসীরাতুল হালবিয়া,১ম খণ্ড, পৃ: ৩৯০)

মক্কায় বসবাসকারী সব গোত্রকেকা'বার সাথে সম্পর্কযুক্ত পদগুলোর বা দায়িত্বাবলীর কোন কোনটি ন্যস্ত থাকত। হাজীদের পানি এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদানের দায়িত্ব বনূ আবদে মনাফের ওপর অর্পিত ছিল। যুদ্ধের সময় পতাকা বহন, কা'বার দ্বাররক্ষকের দায়িত্ব এবং দ্বার-উন-নাদওয়ারব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত ছিল বনূ আব্দুদ্ দ্বারের ওপর। সৈন্যদের পরিচালনার দায়িত্ব ছিল হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদের গোত্র বনূ মখযুমের ওপর। রক্তপন ও জরিমানা ইত্যাদি একত্রিত করার দায়িত্ব ছিল হযরত আবু বকর (রা.)-এর গোত্র বনূ তায়েম বিন মুর্‌রাহ্'র ওপর। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) যখন যৌবনে উপনীত হন তখন এ দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করা হয়।
(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন, হ্যায়কাল, পৃ: ৫৯)

যখন হযরত আবু বকর (রা.) কোন কিছুর দিয়তের সিদ্ধান্ত দিতেন তখন কুরাইশগণ তার সমর্থন করতো এবং তাঁর নির্ধারিত দিয়তের সিদ্ধান্তের সম্মান করতো। আর তিনি ব্যতিরেকে অন্য কেউ রক্তপণের সিদ্ধান্ত প্রদান করলে কুরাইশরা তা পরিত্যাগ করতো এবং তার সমর্থন করতো না।

(উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১১)

'হিলফুল ফুযূল'-এ হযরত আবু বকর (রা.) একজন সভ্য বা সদস্য ছিলেন। এটি ছিল সেই বিশেষ চুক্তি যা দরিদ্র এবং নির্যাতিতদের সাহায্যের জন্য ছিল। প্রাচীন যুগে আরবের কতিপয় ভদ্রলোকের হৃদয়ে এই প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছিল যে, পরস্পর একজোট হয়ে এই অঙ্গীকার করা উচিত যে, আমরা সর্বদা যার যা প্রাপ্য তা অর্জনে তাকে সহায়তা করব আর অত্যাচারীকে অত্যাচারে বাধা দিব। আরবী ভাষায় যেহেতু প্রাপ্য অধিকারকে 'ফযল'ও বলা হয়, যার বহুবচন হলো, 'ফুযূল', তাই এই চুক্তির নাম 'হিলফুল ফুযূল' রাখা হয়।কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে যেহেতু এর প্রস্তাবকারীরা ছিল এমন ব্যক্তিবর্গ যাদের নামে 'ফযল' শব্দটি ছিল, তাই এই চুক্তি 'হিলফুল ফুযূল' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। যাহোক,ফুজ্জারের যুদ্ধের পর, আর সম্ভবত এই যুদ্ধের প্রভাবেই মহানবী (সা.)-এর চাচা যুবায়ের বিন আব্দুল মুত্তালেব-এর হৃদয়ে এই প্রে রণা জাগে যে, এই চুক্তির নবায়ন করা উচিত। অতএব, এই আহ্বানে কতিপয় কুরাইশ গোত্রের প্রতিনিধি আব্দুল্লাহ্ বিন জুদান-এর বাড়িতে সমবেত হয় যেখানে আব্দুল্লাহ্ বিন জুদানের পক্ষ থেকে একটি নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অতঃপর সবাই একজোট হয়ে প্রতিজ্ঞা করে যে, আমরা সর্বদা অত্যাচারকে প্রতিহত করব আর নির্যাতিতকে সাহায্য করব। এই চুক্তিতে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বনূ হাশেম, বনূ মুত্তালেব, বনূ আসাদ, বনূ যোহরা আর বনূ তায়েম (গোত্র) অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহানবী (সা.)ও এই উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন আর চুক্তির অংশ ছিলেন। তাই তিনি নবুয়্যতের যুগে বলতেন, আমি আব্দুল্লাহ্ বিন জুদান-এর গৃহে এমন এক অঙ্গীকারে অংশ নিয়েছিলাম যে, আজ ইসলামের যুগেও কেউ যদি আমাকে সেটির দিকে আহ্বান করে আমিতাতে সাড়া দিব। " (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ১০৪-১০৫)

একজন লেখক হযরত আবু বকর (রা.)-এরও 'হিলফুল ফুযূল'-এ অংশগ্রহণের উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন যে, এই সংগঠনে মহানবী (সা.)ও অংশ গ্রহণ করেছিলেন আর তাঁর সাথে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)ও অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

(সৈয়্যদানা সিদ্দীক আকবর কে শাব ও রোযা, প্রণেতা- মহম্মদ হুযাইফা লাহোরী, পৃ: ১৯)

নবুয়্যত লাভের পূর্বে মহানবী (সা.)-এর সাথে তাঁর সম্পর্ক এবং বন্ধুত্বের অবস্থা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনে ইসহাক এবং তিনি ছাড়া আরো কতিপয় কর্তৃপক্ষ বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর (রা.) নবুয়্যত লাভের পূর্ব থেকেই মহানবী (সা.)-এর সঙ্গী ছিলেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং তাঁর পুণ্য প্রকৃতি ও উত্তম চরিত্র সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ছিলেন। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, অজ্ঞতার যুগেও হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর বন্ধু ছিলেন। (আল বাদাইয়াতু ওয়ান নাহাইয়াতু,২য় খণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃ: ২৯,৩০)

'সিয়ারুস্ সাহাবা' পুস্তকে লিখিত আছে, বাল্যকাল থেকেই মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাঁর অর্থাৎ হযরত আবু বকর(রা.)-এর বিশেষ প্রীতি ও আন্তরিকতা ছিল আর (তিনি) মহানবী (সা.)-এর বন্ধুবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অধিকাংশ বাণিজ্য যাত্রায় সফর সঙ্গী হওয়ার সম্মান (তিনি) লাভ করতেন। ('সিয়ারুস্ সাহাবা', ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৬)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) নবুয়্যত লাভের পূর্বে মহানবী (সা.)-এর বন্ধুবর্গের উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন, নবুয়্যত লাভের পূর্বে মহানবী (সা.)-এর বন্ধু মহলের গণ্ডি খুবই সীমিত দেখা যায়। আসলে শুরু থেকেই তাঁর (সা.) প্রকৃতি ছিল নির্জনতা প্রিয়। আর তিনি নিজ জীবনের কোন অংশেই মক্কার সাধারণ সমাজে খুব বেশি মেলামেশা করেন নি। তথাপি কতিপয় ব্যক্তি, যাদের সাথে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল, তাদের মাঝে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.) অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্ বিন আবি কোহাফা, যিনি কুরাইশদের এক সম্ভ্রান্ত বংশের সদস্য ছিলেন আর নিজ ভদ্রতা ও যোগ্যতার কারণে জাতির মাঝে খুবই সম্মানিত ছিলেন। দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন, হাকীম বিন হিযাম, যিনি হযরত খাদীজা (রা.)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তিনি একান্ত ভদ্র প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। প্রথমদিকে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি, কিন্তু সেই অবস্থায়ও মহানবী (সা.)-এর প্রতি তিনি গভীর ভালোবাসা ও আন্তরিকতা রাখতেন। অবশেষে প্রকৃতিগত পুণ্য (তাঁকে) ইসলামের দিকে টেনে আনে। এছাড়া যায়েদ বিন আমর এর সাথেও মহানবী (সা.)-এর সুসম্পর্ক ছিল। এই ভদ্রলোক হযরত উমর (রা.)-এর নিকটাত্মীয় ছিলেন আর তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা অজ্ঞতার যুগেই শির্ক থেকে দূরে ছিলেন এবং নিজেকে ইব্রাহীম (আ.)-এর ধর্মে র প্রতি আরোপিত করতেন, কিন্তু তিনি ইসলামী যুগের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। "

(সীরাত খাতামাননাবীঈন, পৃ: ১১৪)

যাহোক, মহানবী (সা.)-এর সাথে (ঘনিষ্ট) সম্পর্কের দিক থেকে হযরত আবু বকর (রা.) সবার শীর্ষে ছিলেন। অজ্ঞতার যুগ থেকেই শির্ক এর প্রতি হযরত আবু বকর (রা.)-এর (চরম) ঘৃণা ছিল এবং (তিনি তা) এড়িয়ে চলতেন।

হযরত আবু বকর (রা.) অজ্ঞতার যুগেও কখনো শির্ক করেন নি, আর কখনো কোন প্রতিমার সামনেও মাথা নত করেন নি। যেমন সীরাতুল হালবিয়াতে লেখা আছে, বর্ণনা করা হয় যে, নিশ্চিতরূপে হযরত আবু বকর (রা.) কখনো কোন প্রতিমাকে সিজদা করেন নি। আল্লামা ইবনে জওযী হযরত আবু বকর (রা.)-কে সেসব লোকের মধ্যে গণ্য করেছেন যারা অজ্ঞতার যুগেই প্রতিমা পূজা করতে অস্বীকার করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি কখনো প্রতিমার কাছে যান নি।

(আস সীরাতুল হালবিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৪-৩৮৫)

অজ্ঞতার যুগে(ই) তাঁর মদের প্রতি ঘৃণা ছিল। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা.) অজ্ঞতার যুগে মদকে নিজের জন্য অবৈধ জ্ঞান করতেন। তিনি অজ্ঞতার যুগে এবং ইসলাম গ্রহণ করার পরও কখনো মদপান করেন নি। (কুনযুল উম্মাল, খণ্ড-১২, পৃ: ৪৯০)

এক রেওয়ায়েত অনুসারে, মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের বৈঠকে হযরত আবু বকর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, অজ্ঞতার যুগে আপনি কখনো মদপান করেছেন কি? উত্তরে আবু বকর (রা.) বলেন, 'আউযু বিল্লাহ্' অর্থাৎ, আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। জিজ্ঞেস করা হয়, এর কারণ কী? হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, 'আমি আমার সম্মান রক্ষা করতাম এবং নিজের পবিত্রতা রক্ষা করতাম, কেননা যে ব্যক্তি মদপান করে সে নিজের সম্মান ও পবিত্রতা পদদলিত করে'। বর্ণনাকারী বলেন, একথা মহানবী (সা.)-এর কানে পৌঁছলে তিনি (সা.) বলেন, 'সাদাকা আবু বকর', 'সাদাকা আবু বকর'। অর্থাৎ, 'আবু বকর সত্য বলেছে', 'আবু বকর সত্য বলেছে'। তিনি (সা.) একথা দু'বার বলেন।

(তারিখুল খোলাফা লিসসুয়ুতি, পৃ: ৩০)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ করা সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে রেওয়ায়েত দেখা যায়। (এরমধ্যে) কতক বিস্তারিত আবার কতক সংক্ষিপ্ত। যাহোক, এর মধ্য থেকে কিছু বর্ণনা করছি। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, যখন থেকে আমি বুঝতে শিখেছি (তখন থেকেই) আমার পিতামাতা এই ধর্মের অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের (অনুসারী)

এরপর ১০এর পাতায়....

আল্লাহ্ মানুষ বানিয়েছেন, তোমরা তাকে জন্তু বানাও। মেহেন্দির স্টলে শুধু হাতে মেহেন্দি লাগাও। (এরপর হুযুর আনোয়ার হাত সোজা করে এবং উল্টো করে এবং কব্জি পর্যন্ত ইশারা করে বললেন) এতদূর পর্যন্ত মেহেন্দি লাগাও। মেয়েদের সাজসজ্জায় এটি বৈধ। কিন্তু মুখে মেহেন্দি লাগানো বা ট্যাটু তৈরী করা ইসলামে নিষিদ্ধ। (হুযুর সদর লাজনা সাহেবার কাছ থেকে কৈফিয়ত তলব করেন যে এটি কেন এবং কিভাবে হয়েছিল? সদর সাহেবার উত্তর পাওয়ার পর হুযুর আনোয়ার বলেন) ফেস পেন্টিং কেন রাখা হয়েছিল? এমনটি হওয়া উচিত হয় নি। এখানে যে সব জিন-ভুত তৈরী করে, সেই সবই কি তৈরী করার পরিকল্পনা ছিল? (সদর সাহেবা জানান যে তবলীগের জন্য রাখা হয়েছিল) হুযুর বলেন, তবলীগের জন্য রেখেছিলেন! তবলীগের জন্য কি এই একটি উপায় বাকি থাকল? চেহারা বিকৃত করার অধিকার কারো নেই। ইসলামের স্পষ্ট আদেশ রয়েছে। নিত্য নতুন প্রথার উদ্ভাবন করবেন না। আপনারা লাজনারাই তো নিত্য নতুন প্রথা ও বিদাআতের জন্ম দিচ্ছেন। আপনারা কিভাবে সংশোধন করবেন? এভাবেই পুণ্যের ছদ্মবেশে বেদাতের অনুপ্রবেশ ঘটে। হযরত আদমকে যখন শয়তান প্ররোচিত করেছিল, তখন সে একথা বলে নি যে অমুক কাজ কর, বেশ মজা হবে। প্রথমে সে সৎকর্মের কথা বলেছিল খুব ভাল কাজ, এর দ্বারা তুমি চিরতরে সৎকর্মশীল হয়ে উঠবে। শয়তান আদমকে এভাবেই উস্কানি দিয়েছিল, তাই না? চিরতরে পুণ্যবান বানানোর অঙ্গীকার দিয়ে? অথচএটি শয়তানী অঙ্গীকার ছিল। এই সব শয়তানী কাজ আপনারা করছেন, নিত্যনতুন বিদাত সৃষ্টি করছেন। লাজনা ও পদাধিকারীদের কাজ হল যুগ খলীফার মুখের দিকে চেয়ে থাকা যে তিনি বলছেন। নিজেদের বিদাআত তৈরী করবেন না, নিজের নিজের প্রথা বানিয়ে ফেলবেন না। আর তোমরা মেয়েরা! তোমরা আমার গোয়েন্দ হও আর সঠিক সংবাদ আমার কাছে পৌঁছে দাও।

প্রশ্ন: এক ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করেন যে, কিছু স্বাধীন চিন্তাধারা ও তথাকথিত সাম্যবাদের ধ্বজাধারী মহিলা রয়েছে, যারা ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তি করে যে, কুরআন করীম ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে পুরুষদেরকে জান্নাতে পুরস্কাররাজির মধ্যে অন্যতম হল বিভিন্ন প্রকারের সুরা, বিভিন্ন খাদ্য ও পানীয় এবং নারী লাভের অঙ্গীকার। অথচ এই পৃথিবীতে যারা এই সব কিছু ব্যবহার করে তাদের অসৎ বলে গণ্য করা হয়। অনুরূপভাবে এই অঙ্গীকার কেবল পুরুষদের জন্য, মেয়েরা এই পৃথিবীতে যাই করুক না কেন, তাদের জন্য কোন অঙ্গীকার নেই। এই বিষয়ে বিস্তারিত উত্তরের আবেদন জানাচ্ছি। হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০২১ সালের ২২ মার্চ তারিখে এর উত্তরে লেখেন-

প্রকৃত বিষয় হল এই ধরণের আপত্তি ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে অনভিজ্ঞতার কারণে তৈরী হয়। স্পষ্টতই ইসলামের বিরোধীরা ইসলামের শিক্ষা না জানার কারণে এমন আপত্তি উত্থাপন করে বসে কিন্তু পরিতাপ ও দুঃখের বিষয় হল অনেক তথাকথিত মুসলমানও কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করা আবশ্যক মনে করে না। বেং জাগতিকতা তাদের মন ও মস্তিষ্ককে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, এর আড়ম্বরের পিছনেসারা জীবন নষ্ট করে দেয় আর জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য 'উবুদিয়ত খোদাকে চেনার পথকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলে। এবং পরকালের জীবনের স্বচ্ছ ও পবিত্র নেয়ামতসমূহকেও পার্থিব জীবনের মলিন আয়নায় দেখার চেষ্টা করে। এই কারণে তাদের মনে এই ধরণের আপত্তির জন্ম হয়।

কুরআন করীমে বর্ণিত জান্নাতের নেয়ামতরাজিকে রূপক অর্থে পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তুর নামে বর্ণনা করা হয়েছে, অপরদিকে জান্নাতের এই নেয়ামতরাজিকে যাবতীয় অপবিত্রতা ও কুপ্রভাব মুক্ত আখ্যায়িত করা হয়েছে। জান্নাতে পাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এমন বিভিন্ন পবিত্র পানীয়গুলিকে কুরআন করীম বিভিন্ন নাম ও গুণাবলী সহকারে বর্ণণা করা হয়েছে যা বিবেক ও ঐশী তৈরী করে। সেগুলি সুগন্ধি এবং পবিত্র। যারা এই পানীয়গুলি পান করে তারা এক অবর্ণনীয় আধ্যাত্মিক আসক্তি লাভ করে। সূরা আস সাফাতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

অর্থাৎ (ঝর্ণার) পানি ভর্তি পাত্র তাদের কাছে নিয়ে আসা হবে। অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সুপেয়, পানকারীদের জন্য তৃপ্তিদায়ক। এই (পানীয়) গুলিতে আসক্তি থাকবে না আর এর প্রভাবে কারো বুদ্ধিও ভ্রষ্ট হবে না।

(আসসাফফাত: ৪৬-৪৮)

সূরা ওয়াকেয়াতে বলেন-

চিরকিশোরগণ তাহাদের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া পরিবেশন করিতে থাকিবে। ঝরণার পানি দ্বারা পূর্ণ পান-পাত্র,সুরাহী এবং পেয়ালাসমূহ লইয়া। উহার দরুন তাহাদের শিরঃপীড়া হইবে না এবং তাহারা মাতালও হইবে না।

(আল ওয়াকেয়া: ১৮-২০)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

" 'আবে জুলাল' এর ন্যায় পবিত্র পানীয়র পান-পাত্র জান্নাতবাসীদেরকে দেওয়া হবে। সেই পানীয় কোন শিরপীড়া তৈরী করবে না বা অচেতন করবে না। জান্নাতে কোন নিরর্থক কথাবার্তা শুনতে পাওয়া যাবে না আর কোন পাপের কথাও শোনা যাবে না। সর্বত্র কৃপা ও ভালবাসা ও আনন্দের চিহ্ন হিসেবে কেবল শান্তি শান্তি রব শোনা যাবে।..... এই গোটা আয়াতটি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সেই জান্নাতের পানীয়ের সঙ্গে জাগতিক পানীয়ের কোন সাদৃশ্য নেই। বরং সেগুলির গুণ এই সব পানীয় থেকে একেবারেই ভিন্ন। তাছাড়া কুরআন করীমের কোথাও একথা বলা হয় নি যে, সেগুলি এই পৃথিবীর সুরার ন্যায় আঙুর বা এই ধরণের কোন বস্তু থেকে তৈরী করা হবে। বরং আল্লাহ্র বাণীতে বার বার একথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, সেই পানীয়ের প্রধান উপকরণ হবে ভালবাসা এবং মারেফাত বা তত্ত্বজ্ঞান, যা একজন মোমেন বান্দা এই জগত থেকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। আর একথাও বর্ণিত হয়েছে যে সেই আধ্যাত্মিক কর্ম কিভাবে পানীয় হিসেবে দৃশ্যমান হবে। এটি খোদা তা'লার অজস্র রহস্যাবলীর মধ্যে একটি রহস্য যা খোদার পরিচয় লাভকারী ব্যক্তির নিকট দিব্য-দর্শনের মাধ্যমে উন্মোচিত হয়। আর বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাবলী দেখে এই সত্যে উপনীত হয়।

(সুরমা চাশম আরিয়া, রূহানী খাযায়েন, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৫৬-১৫৭)

অনুরূপভাবে জান্নাতে যে সঙ্গী পাওয়ার কথা উল্লেখিত আছে তাদের পবিত্রতাও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তারা অত্যন্ত পবিত্র ও পুণ্যবান সঙ্গী হবে যাদেরকে অতীব মূল্যবান মুক্তোমালার ন্যায় আচ্ছাদিত করে লুকিয়ে রাখা হবে। তারা এমন হবে যাদেরকে পূর্বে সেই সব জান্নাতিরা ছাড়া অন্যও কেউ স্পর্শ করে নি। আর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা বর্ণিত হয়েছে তা হল-

অর্থাৎ আমরা জান্নাতীদেরকে এই সুন্দর সঙ্গীদের সঙ্গে বিবাহ দিব।

(সূরা তুর:২১)

কাজেই জান্নাত শুধু আনন্দ উপভোগ ও বিলাসিতা করার স্থান নয়, বরং অতি মূল্যবান ও আধ্যাত্মিক এক স্থান। যদিও জান্নাতের নেয়ামতরাজির নাম পার্থিব বস্তুসমূহের নামে রাখা হয়েছে , কিন্তু এর দ্বারা আধ্যাত্মিক নেয়ামতকে বোঝানো হয়েছে, সেগুলি কোনও পার্থিব বস্তু নয়। এটি ঠিক সেই রকম বিষয়, যেমন কোন বিত্তবান ব্যক্তি কোন বিদ্বান ব্যক্তিকে যখন বলে যে তার কাছে সম্পদ রয়েছে, তখন সেই বিদ্বান তার গ্রন্থাগারের দিকে ইঙ্গিত করে বলে, 'আমার কাছে তোমার চেয়েও বেশি ধনভাণ্ডার রয়েছে।' এই উত্তরের মোটেই এই অর্থ নয় যে, সেই সব বই-পুস্তকে টাকাপয়সা ভর্তি রয়েছে। বরং এর অর্থ হল যে বস্তুকে তুমি সম্পদ হিসেবে ধর, তার থেকেও বেশি উপকারী বস্তু আমার কাছে রয়েছে। হযররত মুসলেহ মওউদ (রা.) তফসীরে কবীরে এই ধরণের আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে বলেন-

প্রথমত একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, কুরআন করীম স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে পরকালের পুরস্কাররাজি সম্পর্কে জানা মানুষের বিবেক বুদ্ধির ক্ষমতার বাইরে। কাজেই ইহজাগতিক জীবন দ্বারা পরকালের জীবন সম্পর্কে ধারণা করা সঠিক হবে না। কুরআন করীম বর্ণনা করে -

অর্থাৎ কোন মানুষ ধারণা করতে পারে না যে, তাদের জন্য পরকালে কি কি নিয়ামতরাজি লুক্কায়িত আছে। এর থেকে বোঝা যায় যে, জান্নাত সম্পর্কে যা কিছু কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে সেগুলি সবই রূপক ভাষায়। এর সেই সব অর্থ বের করা সঠিক হবে না যা পৃথিবীতে এই ধরণের শব্দাবলী দ্বারা করা হয়। ..... যখন কুরআন করীম একথা বলে যে মোমেন সেই জান্নাত লাভ করবে যেখানে ছায়াদানকারী বৃক্ষরাজি ও নহর রয়েছে এবং দুধ রয়েছে যা কখন বিনষ্ট হয় না আর রয়েছে পানি যাতে পচন ধরে না আর মোম ও অশুদ্ধি মুক্ত পবিত্র মধু এবং অন্তরকে পরিশুদ্ধকারী পানীয় যা আসক্তি হতে দেয় না। এর দ্বারা সেই সব আপত্তির উত্তর এইভাবে দেওয়া হয়েছে যে,যে-সব বস্তুকে তোমরা নেয়ামত বলে মনে কর,সেগুলি সেই সব নেয়ামতত থেকে তুচ্ছ যেগুলি প্রকৃত মোমেনদের পাওয়ার কথা। যে সব নহরগুলিকে তোমরা নেয়ামত বলে মনে কর সেগুলির পানি পচনশীল,কিন্তু মোমেনরা সেব সব নহর লাভ করবে যার পানি দূষিত হবে না। আর যে বাগানগুলিকে তোমরা নেয়ামত বলে মনে কর, সেগুলি প্রকৃত নেয়ামত নয়, প্রকৃত নেয়ামত হল সেই বাগানগুলি যেগুলি কখনও নষ্ট হবে না আর সেগুলি কেবল মোমেনরাই লাভ করবে। যে পানীয়কে তোমরা নেয়ামত বলে মনে কর,মোমেনদের সেগুলির প্রয়োজন নেই, সেগুলি তো অপবিত্র এবং যেগুলি মানুষের বিবেককে আচ্ছন্ন করে রাখে। আল্লাহ্ তা'লা মোমেনদেরকে সেই পানীয় দান করবেন যা তাদের বুদ্ধিকে আরও প্রখর ও পবিত্র করবে। আর যে মধু নিয়ে তোমরা গর্ব কর,তার মধ্যে তো অশুদ্ধি থাকে, খোদা তা'লা মোমেনদেরকে এমন মধু দান করবেন যা যাবতীয় অশুদ্ধি থেকে পবিত্র হবে। আর যে সঙ্গীদের নিয়ে তোমরা গর্ব কর তারা নেয়ামত নয়, কারণ তারা অপবিত্র। আল্লাহ্ তা'লা মোমেনদেরকে এমন সঙ্গী দান করবেন যারা হবে পবিত্র। যে ফলমূল নিয়ে তোমাদের গর্ব সেগুলি তো শেষ হয়ে যায়, মোমেনরা সেই ফল লাভ করবে যা অফুরন্ত এবং

সেগুলি প্রত্যেক ঋতুতেই এবং তাদের ইচ্ছে মত পাওয়া যাবে। এই বিষয়টি এমন স্পষ্ট যে, বিদ্বেষমুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি যদি প্রণিধান করে, তাহলে এর অর্থ ও নিগূঢ় তত্ত্ব অনুধাবন করা যেতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি ধর্মান্ধ বা অজ্ঞ, তার তো কোনও প্রতিকারই নেই। ..... বস্তুত, কুরআন করীমে যে সব বাগান, নহর, ফলমূল, দুধ, মধু এবং পানীয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে, তা এই জগতের বাগান, নহর এবং ফলমূল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানকার দুধ, মধু এবং পানীয় এই পৃথিবীর দুধ ও মধু ও পানীয় থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কুরআন করীম নিজেই এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছে। কুরআনের এই ব্যাখ্যার পর এ বিষয়ে সংশয় পোষণ করা বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ মাত্র আর এই প্রবাদগুলি যেহেতু অতীতের ধর্মগ্রন্থসমূহে বিদ্যমান, তাই এই আয়াতসমূহে এমন কোন বিষয় নেই যা মানুষের পক্ষে বোঝা কঠিন হতে পারে।"

(তফসীর কবীর, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৪১-২৪৬)

এছাড়া পরলৌকিক জীবনের সেই সব নেয়ামতসমূহকে জাগতিক নাম দেওয়া হয়েছে মানুষকে বোঝানোর জন্য এবং সেগুলির প্রতি তাদেরকে আকৃষ্ট করতে। কেননা ধর্ম হল সকলের জন্য, তাই দুর্বোধ্য বিষয়কে বোঝাতে এমন শব্দাবলী ব্যবহার করা আবশ্যক হয়ে পড়ে যা প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষ বুঝতে পারে এবং তা থেকে উপকৃত হতে পারে। এই প্রজ্ঞাপূর্ণ রীতি অনুসরন করে কুরআন করীম পারলৌকিক জীবনের নেয়ামতসমূহের জন্য এমন ভাষা ব্যবহার করেছে যা প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের বোধ-বুদ্ধি ও মর্যাদা অনুসারে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। এছাড়া মক্কার কাফেররা যেহেতু মুসলমানদেরকে এই বলে কটাক্ষ করত যে, এরা নিজেরাও সব রকম নেয়ামত থেকে বঞ্চিত আর আমাদেরকেও এই সব নেয়ামত থেকে বঞ্চিত রাখতে চায়। সেই কারণে আল্লাহ্ তা'লা পরলৌকিক নেয়ামতসমূহকে তাদের রুচির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে এই জাগতিক বস্তুসমূহের নামে নামকরণ করেছেন, যেগুলিকে তারা নেয়ামত মনে করত। আর সেই সব বস্তুর নাম উল্লেখ করে বলেছেন যে মোমেনরা এই সব বস্তু লাভ করবে। অন্যথায় কুরআন ও হাদীসে এই বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জান্নাতে এমন সব নেয়ামত দেওয়া হবে যা পূর্বে কোন চোখ দেখে নি, কোন কান যে সম্পর্কে কখনও শোনে নি আর কোনও হৃদয়ে সে সম্পর্কে ধারণা জন্মায় নি। তবে যে সমস্ত পুণ্যবান মানুষেরা এই পৃথিবীতে থাকাকালীন জাগতিক কলুষতা থেকে বিরত থেকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে ধাবিত হয়, তাদেরকে এই জগতেই সেই সব নেয়ামতের আস্বাদন দেওয়া হবে। আর এমন মানুষেরা যখন জান্নাতে সেই সব নেয়ামতগুলি পরিপূর্ণরূপে লাভ করবে, তখন তারা অবলীলায় বলে উঠবে= هٰذَا الَّذِیْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ এটা তো সেই রিযক যা আমাদেরকে পূর্বেও দেওয়া হয়েছিল।

অর্থাৎ, "কোন সৎকর্মশীল ব্যক্তি জানে না যে, তাহার জন্য কী কী নেয়ামত লুক্কায়িত আছে" ( ) । অতএব, খোদা এই সব নেয়ামতকে গুপ্ত বলিয়া নির্ধারিত করিয়াছেন। পার্থিব নেয়ামতসমূহের মধ্যে উহাদের নমুনা নাই। ইহা সুস্পষ্ট যে, পৃথিবীর নেয়ামত আমাদের নিকট গোপন নহে। দুগ্ধ, আনার, আঙ্গুর প্রভৃতি জিনিসকে আমরা জানি এবং সদা-সর্বদা এই সব জিনিস খাই। সুতরাং, ইহা সহজবোধ্য যে,ঐ সমুদয় জিনিষ অন্য কিছু। ঐগুলির সঙ্গে এই সকল জিনিষের যে মিল, তাহা শুধু নামেই। সুতরাং, যে ব্যক্তি বেহেশতকে পার্থিব জিনিষের সমাহার বলিয়া বুঝিয়াছে, সে কুরআন শরীফের এক অক্ষরও বুঝে নাই।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আমাদের সৈয়্যদ ও মৌলা নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন যে, বেহেশত ও উহার নেয়ামত হইতেছে এমন সব জিনি, যাহা কখনও কোন চক্ষু দর্শন করে নাই, কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই এবং কোন হৃদয় ধারণা করে নাই। অথচ আমরা পার্থিব নেয়ামতসমূহ চোখেও দেখি, কানেও শুনি এবং মনের মধ্যেও ঐগুলি উপলব্ধ হয়। সুতরাং, যেহেতু খোদা ও তাঁহার রসুল এই সমুদয় জিনিষকে এক প্রকার স্বতন্ত্র জিনিষ বলিয়া প্রকাশ করেন, সেহেতু আমরা তখন কুরআন হইতে দূরে চলিয়া যাই,যখন মনে করি যে, বেহেশতেও পৃথিবীরই দুগ্ধ থাকিবে যাহা গাভী, ও মহিষ দোহনে পাওয়া যায় প্রকারন্তরে ইহাতে একথা স্বীকার করা হয় যে, সেখানে দুগ্ধ প্রদায়িনী পশুর পালসমূহ মজুদ থাকিবে, বৃক্ষে মধু মক্ষিকারা বহু মৌচাক তৈরী করিবে এবং ফিরিশতাগণ অনুসন্ধান করিয়া সেই মধু সংগ্রহ করিয়া নদ-নদীতে ঢালিয়া দিবে। ইত্যকার ধারণার সঙ্গে কি সেই শিক্ষার কোন সামঞ্জস্য আছে, যেখানে এই আয়াতসমূহে রহিয়াছে যে, পৃথিবীবাসী কখনও ঐ সব জিনিস দেখে নাই এবং ঐসব জিনিষ আত্মাকে আলোকিত করে খোদার মারেফাত বৃদ্ধি করে এবং ঐগুলি আধ্যাত্মিক খাদ্য, যদিও ঐ সকল খাদ্যের সামগ্রিক চিত্র বাস্তবের রঙে প্রকাশ করা হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে, এগুলির মূল উৎপত্তিস্থল আত্মা ও সত্যতা?

(ইসলামি ওসুল কি ফিলাসফি, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৭-৩৯৮)

ইসলামী বেহেশতেরর ইহাই মূল তত্ত্ব। উহা ইহজগতের ঈমান ও সৎকর্মের প্রতিচ্ছায়া। উহা নতুন কোন জিনিস হইবে না, যাহা বাহির হইতে আসিয় মানুষের নিকট উপস্থিত হইবে। বরং মানুষের বেহেশত মানুষের অভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইয়া থাকে। প্রত্যেকের বেহেশত তাহার ঈমান এবং আমলে সালেহ (সময়োপযোগী সৎকর্ম)। এই জগতেই এগুলির উপভোগ শুরু হইয়া যায় এবং গুপ্তভাবে ঈমান ও সৎকর্মের বাগান দৃষ্টিগোচর হয়। এবং নহর সময়ও পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু পরজগতে এইসব বাগান সুস্পষ্টরূপে অনুভূত হইবে। খোদার পবিত্র শিক্ষা আমাদিগকে ইহাই জানায় যে, সত্য-পবিত্র-সুদৃঢ় এবং পরিণত ঈমান, যাহা খোদা এবং তাঁহার গুণাবলী ও তাঁহার ইচ্ছার সহিত সঙ্গাতিপূর্ণ, তাহা সুরম্য ফলদার বৃক্ষরাজিপূর্ণ বেহেশত, এবং আমলে সালেহ সেই বেহেশতের নদ-নদী ।"

(ইসলামি ওসুল কি ফিলাসফি, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৩৯০)

আর যতদূর আপনার প্রশ্নের সেই অংশের সম্পর্ক যেখানে আপনি বলেছেন যে পরকালে কেবল পুরুষদের নেয়ামতসমূহের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, নারীদের জন্য এমন কোনও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নি- এই প্রশ্নটিও ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞানতার পরিণাম। কেননা কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে যেখানে পুণ্যবান পুরুষদেরকে পরকালে পুরস্কারের উত্তরাধিকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, সেখানে পুণ্যবতী মহিলাদেরকেও সেই সব পুরস্কারের অংশীদার হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। যেমনটি বলা হয়েছে--

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا

অর্থ: এবং যে কেহ সৎকাজ করে, নর হউক বা নারী এবং সে মোমেন- এই প্রকারের ব্যক্তিগণ জান্নাতে প্রবেশ করিবে, এবং তাহাদের উপর খর্জুর-আঁটির ছিদ্র পরিমাণও অন্যায় করা হইবে না। (আননিসা:১২৫)

অনুরূপভাবে বর্ণিত হয়েছে-"যে ব্যক্তি মন্দ করিবে তাহাকে কেবল তদনুরূপ প্রতিফল দেওয়া হইবে এবং যে ব্যক্তি মো'মেন হওয়া অবস্থায় সৎকর্ম করিবে, সে পুরুষ হউক বা নারী, সুতরাং এই সকল লোক জান্নাতে প্রবেশ করিবে, যেখানে তাহাদিগকে বেহিসাব রিযক দেওয়া হইবে।"

(আল মোমেন:৪১)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এই বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেন: "পূর্ববতী জাতিরা নিশ্চয় পুরুষদের সম্পর্কে নিয়ম=কানুন তৈরী করেছিল। কিন্তু তাতে নারীদের অধিকার সম্পর্কে কোথাও কোনও উল্লেখ করে নি। রসুল করীম (সা.) প্রথম ব্যক্তি যিনি শিক্ষা দিয়েছেন যে, যেভাবে পুরুষদের অধিকার নারীদের দায়িত্বে রয়েছে, অনুরূপভাবে নারীদের অধিকার পুরুষদের দায়িত্বে রয়েছে।

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِیْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

যেভাবে নারীর উপর পুরুষদের অধিকার রয়েছে, অনুরূপভাবে নারীরও অধিকার রয়েছে যা পুরুষদের প্রদান করা উচিত। এছাড়া তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর উন্নতির পথ উন্মোচিত করেছেন, তাদেরকে বিষয়-সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার দিয়েছেন। তিনি তাদের আবেগ অনুভূতির প্রতি যত্নবান থেকেছেন, তাদের শিক্ষাদীক্ষার তত্ত্বধান করেছেন, এবং এর আদেশ দিয়েছেন, এবং সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন যে, যেভাবে জান্নাতে পুরুষদের জন্য পর্যায়ক্রম রয়েছে, যেগুলি অসীম, অনুরূপভাবে নারীর জন্যও অসীম উন্নতির পথ খোলা আছে।"

(খুতবা জুমআ, প্রদত্ত ২৬ শে নভেম্বর, ১৯৩৭, ৪ ডিসেম্বর, ১৯৩৭)

একবার হুযুর (রা.) বলেন: 'কুরআন করীম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অধ্যয়ন করে দেখ! সকল বিষয়াবলী, বিধিনিষেধ এবং পুরস্কারাজিতে পুরুষ ও মহিলা, উভয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন যদি বলা হয়ে পুণ্যবান পুরুষ, তবে পুণ্যবতী মহিলার কথা সেই সঙ্গেই উল্লেখ করা হয়। কোন জায়াগায় ইবাদতকারী পুরুষের কথা থাকলে ইবাদতকারী মহিলার কথাও থাকবে। যদি বলা হয় জান্নাতে পুরুষরা যাবে তবে সেই সঙ্গে মহিলাদেরও জান্নাতে যাওয়ার উল্লেখ থাকবে। পুরুষের যদি উচ্চমানের পুণ্য কর্ম থাকে আর জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদায় স্থান পায়, তবে তার স্ত্রীকেও,যার পুণ্য সেই মর্যদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলেও স্বামীর পুণ্যের কারণে সেই স্থানেই ঠাঁই পাবে। অনুরূপভাবে স্ত্রী যদি উচ্চমানের পুণ্যকর্মের অধিকারী হয়, এবং সেই পুণ্যের কারণে তাকে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা দান করা হয়, তাহলে পুণ্যের ক্ষেত্রে তার চেয়ে মর্যাদায় নিম্নতর হয়েও তার স্বামী স্ত্রীর কারণে সেই একই স্থান লাভ করবে।

(১৯৫০ সালের ৩১ শে জুলাই প্রদত্ত ভাষণ, আল ফযল, ১৪ই নভেম্বর, ১৯৬২, পৃ: ৪)

ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে মেয়েদের দায়িত্বাবলী এবং এই পৃথিবীতে তাদের অধিকার ও

আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং কুরআন মজীদের রক্ষক

-মৌলানা মহম্মদ হামীদ কওসার, নাযির দাওয়াতে ইলাল্লাহ্, দক্ষিণ ভারত

(৩য় পর্ব..,)

মুসাইলামা কাযযাব তার চল্লিশ হাজার অনুগামী সহ খালিদ বিন ওয়ালিদ-এর সেনাদলের সঙ্গে যুদ্ধ করে। দু'দলের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ হয়, বহু সাহাবা শহীদ হন, যাদের মধ্যে অনেকে কুরআন করীমের হাফিয ও ক্বারী ছিলেন। বুখারীর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা.) বর্ণনা করেন যে, এই দুর্ঘটনার পর হযরত আবু বাকার (রা.) আমাকে কাছে ডাকেন। সেই সময় হযরত উমর বিন খাত্তাবও তাঁর কাছে ছিলেন। হযরত আবু বাকার (রা.) আমাকে অর্থাৎ যায়েদ বিন সাবিত কে সম্বোধন করে বললেন, উমর আমার কাছে এসে বলেছেন ইয়ামামার যুদ্ধেধ কুরআন করীমের বহু হাফিয শহীদ হয়েছেন। এছাড়াও আরও অনেক স্থানে প্রবীন হাফিযরা শহীদ হয়েছেন এবং তাঁরা একে একে ইহধাম ত্যাগ করছেন। অতএব, আমার আবেদন এই যে, আপনি কুরআন করীম একত্রিত করার আদেশ করুন। আমি হযরত উমরকে জিজ্ঞাসা করলাম যে এই কাজ কিভাবে করতে পারি যা রসুলুল্লাহ্ (সা.) করেন নি? হযরত উমর বললেন, খোদার কসম! তবু এটি খুব ভাল কাজ। কাজে হযরত উমর বার বার আমাকে একথা বলতে থাকেন। পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'লা আমার বক্ষ উন্মোচন করেন। হযরত আবু বাকার (রা.)-এর নিম্নোক্ত শব্দাবলী প্রণিধানযোগ্য।

আল্লাহ্ তা'লা কুরান করীম একত্রিত করার জন্য হযরত আবু বাকারের বক্ষ উন্মোচন করেছেন। সৈয়্যদানা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রথম খলীফা, যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন- (তওবা: ৪০)। দুই জনের মধ্য থেকে একজন। তাঁর বক্ষ আল্লাহ্ তা'লা উন্মোচন করেছেন, যিনি কুরআন মজীদ নাযেল করেছেন। আর এর মাধ্যমে সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন 'ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন; (সূরা আল হিজর: ১১)

কুরআন করীমকে একত্রিত করানোর কাজ, সংরক্ষণ করা এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা সংরক্ষণ করে যাওয়া আল্লাহ্ তা'লার দায়িত্ব। বুখারীর হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে কুরআন মমজীদ যা বিভিন্ন স্থানে লিখিত আকারে মজুদ ছিল, সেগুলিকে একত্রিত করার জন্য আল্লাহ তা'লা হযরত যায়েদ বিন সাবিতের বক্ষ উন্মোচন করেন। তিনি কুরআন করীমকে খেজুর কাঠের ফলক ও পাথরের স্লেটে এবং 'সুদুরুর রিজাল' মানুষদের বক্ষ থেকে সংরক্ষণ করেছেন, এবং একত্রিত করেছেন।

একথা স্মরণ রাখার যোগ্য যে, হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা.) কুরআন করীমকে একত্রিত করার এই কাজ গোপনে করছিলেন না। বরং এই কাজ তিনি মদিনাতে থেকেই করছিলেন। সেই সময় মদিনায় হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলি এবং প্রবীণ সাহাবাগণও ছিলেন। তাদের উপস্থিতিতে কোন সংযোজন বা বিয়োজনের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। আর কেউ এমন সংশয়ও প্রকাশ করেন নি। গ্রন্থাকারে এই কুরআন করীম হযরত উম্মুল মোমেনীন, হযরত উমর (রা.)-এর কন্যা এবং হযরত মহম্মদ (সা.)-এর সহধর্মিণী হযরত হাফসা (রা.)-এর কাছে আমানত স্বরূপ সংরক্ষিত হয়। পরবর্তীতে হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমা যখন অনারব এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত হল এবং অনারব এবং দূর দূরান্তের আরব গোত্রগুলো যখন ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করল, আর্মেনিয়া, আজার বাইজানও ইসলামে প্রবেশ করল, তখন দূর দূরান্তের এলাকায় কুআন করীমকে সঠিক উচ্চারণ বিধি ও বিন্যাসের সঙ্গে পড়ার জন্য প্রকৃত ও সনদ কুরআন মজীদের অনুলিপি বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ভাবনা মাথায় এল। সুতরাং হযরত উসমান আসল কুরআনমজীদটি হযরত হাফসার কাছ থেকে চেয়ে পাঠান এবং হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের, হযরত সাঈদ বিন আস, হযরত আব্দুর রহমান বিন বিন আল হারিসকে নির্দেশ দিলেন এর আরও অনেক অনুলিপি তৈরী করতে। তাঁরা এই সমস্ত কাজ করেছেন মদিনায় জেষ্ঠ্য সাহাবাদের উপস্থিতিতে। আসল কপিটি হযরত উসমান (রা.) হযরত হাফসা (রা.) কে ফেরত পাঠিয়ে দেন।

বুখারী কিতাবুত তাফসীর)

আপত্তিকারীদের যাবতীয় মনোযোগ হযরত আবু বাকার এবং হযরত উসমান (রা.)-এর যুগের কুরআন করীম একত্রিত করা এবং তার অনুলিপি তৈরী করানোর প্রতি নিবদ্ধ রয়েছে আর একথা বলে নিজেদেরকেও এবং অপরাপর সকলকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে যে দুইজন খলীফা কুরআন লিখেছেন। তাদের স্মরণ থাকা উচিত ছিল যে, কুরআন করীম হাজার হাজার সাহাবা এবং তাবেঈনদের স্মৃতিতে ও হৃদয়ের মধ্যে অনেক আগে থেকেই সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু একটি সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে তা একত্রিত করা হয়েছিল।

৩নং আপত্তি:

আপত্তিকারীরা লিখেছে যে, কুরআন করীম হিসেবে একাধিক গ্রন্থ লেখা হয়েছিল। হযরত উসমান সেগুলিকে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেন এবং নিজের কুরআন প্রবর্তন করেন যা এ যাবৎ পঠিত হচ্ছে।

উত্তর: হযরত উসমান (রা.) তাঁর স্বরচিত কুরআন প্রবর্তন করেছিলেন, এমন আপত্তি একেবারে ভুল এবং ভিত্তিহীন। এর বিস্তারিত বিবরণ হল ১) হযরত আবু বাকার (রা.) এর খিলাফতকাল ছিল ১১ হিজরী থেকে ১৩ হিজরী পর্যন্ত (৬৩২-৬৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত) প্রায় দুই বছর। হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকাল ছিল ১৩ হিজরী থেকে ২৪ হিজরী প্রায় এগারো বছর পর্যন্ত। হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকাল ছিল ২৪ হিজরী থেকে ৩৫ হিজরী অর্থাৎ প্রায় ১১ বছর পর্যন্ত। আর হযরত আলির খিলাফতকাল ছিল ৩৫ হিজরী থেকে ৪০ হিজরী পর্যন্ত প্রায় চার বা পাঁচ বছর।

হযরত আবু বাকার ও হযরত উমরের সম্মিলিত ১৩ বছরের খিলাফতকালে হাজার হাজার হাফিয ও লক্ষ লক্ষ মুসলমানদের হৃদয়ে কুরআন করীম সংরক্ষিত হয়ে গিয়েছিল। আর সেই কুরআনই ছিল যা আঁ হযরত (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল।

এই হাফেযরা ইসলামী ও অ-ইসলামী দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এখন প্রশ্ন হল, সেই সব হাফেযদের হৃদয় থেকে আসল কুরআনকে মুছে ফেলে স্বরচিত কুরআনে প্রবেশ করানো হযরত উসমানের জন্য কি সম্ভব ছিল?? চৌদ্দশ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর আজও সেই কুরআন মুসলমানদের হৃদয়ে গ্রোথিত আছে যা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে হযরত জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে নাযেল হয়েছিল। সেটিকে সংশয়পূর্ণ করার শত চেষ্টা হয়েছে, আল্লাহ্ সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করেছেন। অতএব আপত্তিকারীদের উচিত সেই চৌদ্দশ বছরের ইতিহাস দৃষ্টিপটে রাখা।

উপরোক্ত বুখারীর হাদীসেও উল্লেখ রয়েছে যে আসল কুরআন হযরত হাফসাকে ফেরত দেওয়া হয়েছিল।

(ক্রমশ..)

১ম পাতার পর.....

তার মত হতে পারে যে সৃষ্টি করে। কিন্তু এখানে একথা বোঝানো হয় নি। আল্লামা মাখশারি এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যে, মুশরিকরা খোদা তা'লার গুণাবলী আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে দিয়ে আল্লাহ্ তা'লাকেও একটি সৃষ্টি হিসেবে আখ্যায়িত করত। এই জন্য বলা হয়েছে যে, এভাবে খোদা তা'লার উপর অভিযোগ বর্তায়, তোমাদের মিথ্যা উপাস্যের মর্যাদা বৃদ্ধি হয় না। খোদা তা'লার মর্যাদাই খাটো করতে হয়। কিন্তু খোদা তা'লা কি সেই সব তুচ্ছ সত্তাবলীর সমকক্ষ হতে পারেন? আমার মতে উপরোক্ত অভিযোগের তুলনায় এই উত্তরটি ততটা যুক্তিসঙ্গত নয়।

আমার মতে এই প্রশ্নের উত্তর সেই ক্রমবিন্যাসকে দৃষ্টিতে রেখে দেওয়া যেতে পারে যা আমি পূর্বের আয়াতে বর্ণনা করেছি। আসল বিষয় যেমনটি আমি বর্ণনা করেছি তা এই ছিল যে, খোদা তা'লা কি কাউকে ইলহাম প্রেরণের কোনও প্রয়োজন আছে? মুশরিকরা নিজেদের উপাস্যদের সম্পর্কে একথা প্রকাশ করত যে, তাদের উপাস্যরা এজন্য ইলহাম নাযেল করে না যে এটি তাদের মর্যাদার পরিপন্থী। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, একথা সত্য নয়। বরং তারা এমনটি করার শক্তিই রাখে না। তারা আধ্যাত্মিক বা জাগতিক কোন নেয়ামত দানের ক্ষমতাই রাখে না। তবে তোমরা কিভাবে ধারণা করলে যে, খোদা তা'লাও তাদের মত হবেন। অধিকন্তু তিনি ইলহাম করার শক্তি রাখেন। অএতব যেভাবে তিনি জাগতিক নেয়ামত দান করেছেন, অনুরূপভাবে আধ্যাত্মিক নেয়ামতও দান করেন। তোমরা মনে কর, যে তিনিও তোমাদের কল্পিত উপাস্যের ন্যায় অসহায় হয়ে বসে থাকবেন। কিন্তু তিনি তো সেই জীবিত ও শক্তিশালী খোদা,যিনি জাগতিক উন্নতির জন্য অজস্র উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। তাই তিনি তোমাদের উপাস্যের ন্যায় আ্যাত্মিক উন্নতির মার্গদর্শনে কেন অনীহা প্রকাশ করবেন? তোমাদের উপাস্যরা যে এমনটি করে না, তা তাদের উচ্চ মর্যাদার কারণে নয়, তাদের অপারগতার কারণে। কিন্তু খোদা অপারগ নন, তাই তিনি ঐশী বাণী প্রেরণ করতে থাকেন এবং প্রেরণ করতে থাকবেন। পরের আয়াতটিও এই অর্থের সমর্থন করছে।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার নেয়ামতরাজি গননা করতে চাইলেও তোমার তা করতে পারবে না অতএব, যেভাবে তিনি জাগতিক নেয়ামতসমূহ নাযেল করেছেন, অনুরূপে আধ্যাত্মিক নেয়ামতসমূহ কেনই বা নাযেল করবে না এবং শক্তিহীন মিথ্যা উপাস্যের ন্যায় মূক হয়ে বসে থাকবেন?

দ্বিতীয়ত তিনি অতীব ক্ষমাশীল ও কৃপাশীল। যদি তিনি হেদায়াত না দান করেন, তবে দুর্বলদের ক্ষমা ও যোগ্য মানুষদের সম্মান বৃদ্ধির উপকরণ কিভাবে সৃষ্টি হবে? তিনি যদি হেদায়াত দানে অনীহা প্রকাশ করেন, তবে সেই সঙ্গে তাঁর ক্ষমাশীলতা ও কৃপাশীলতার গুণও রহিত হয়ে যায়। কাজেই তিনি এমনটি করতে পারেন না।

(তফসীরে কবীর, ৪র্থ খণ্ড,পৃ: ১৪৮, কাদিয়ানে মূদ্রিত)

ছিলেন। এমন কোন দিন আমরা অতিবাহিত করিনি যেদিন মহানবী (সা.) সকাল-সন্ধ্যা অর্থাৎ দু'বেলা আমাদের কাছে না আসতেন। (সহী বুখারী, কিতাবুল কাফালাত, হাদীস-২২৯৭)

হযরত আবু বকর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ করা সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণনা করা হয়।

যুরকানীর ব্যাখ্যায় হযরত আবু বকর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, একদিন হযরত আবু বকর (রা.) হাকীম বিন হিযাম এর গৃহে ছিলেন তখন তাঁর দাসী এসে বলে, তোমার ফুপু খাদীজা (রা.) বলছে যে, তঁ ার স্বামী মূসার মতোনবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। তখন হযরত আবু বকর (রা.) সবার অলক্ষ্যে সেখান থেকে বেরিয়ে যান এবং মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন আর ইসলাম গ্রহণ করেন।

(শারাহ যুরকানি আলা মোওয়াহিবুললাদানিয়া,১ম খণ্ড, পৃ: ৪৪৭-৪৪৮)

সীরাত ইবনে হিশাম এর তফসীর 'আররুসুল উনুফ' পুস্তকে হযরত আবু বকর (রা.)-এর একটি স্বপ্ন এবং ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে হযরত আবু বকর (রা.) একটি স্বপ্ন দেখেন। তিনি দেখেন যে, মক্কায় চাঁদ নেমে এসেছে। এরপর তিনি দেখেন, সেটি টুকরো টুকরো হয়ে মক্কার সর্বত্র এবং সকল গৃহে ছড়িয়ে পড়েছে। এর এক একটি টুকরো প্রত্যেক গৃহে প্রবেশ করেছে, এরপর সেই চাঁদকে যেন তাঁর কোলে একত্রিত করে দেওয়া হয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.) কোন কোন আহলে কিতাব আলেমের কাছে এই স্বপ্নের উল্লেখ করলে তারা এর এই ব্যাখ্যা করেন যে, যার জন্য প্রতীক্ষা করা হচ্ছে সেই নবীর যুগ এসে গেছে এবং আপনি সেই নবীর অনুসরণ করবেন আর এ কারণে আপনি মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান হবেন। এরপর মহানবী (সা.) যখন হযরত আবু বকর (রা.)-কে ইসলামের দাওয়াত দেন তখন তিনি আর বিলম্ব করেন নি।

(আররওজুল উনাফ ফি তাফসীরিস সিরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩১, ইসলাম আবি বাকার, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত)

সুবালুল হুদা পুস্তকে হযরত আবু বকর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ সংক্রান্ত একটি রেওয়ায়েত এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, কা'ব বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণ ছিল আকাশ থেকে অবতীর্ণ একটি ঐশী বাণী। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো এই যে, হযরত আবু বকর (রা.) ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি একটি স্বপ্ন দেখেন এবং সেই স্বপ্ন তিনি বহীরা রাহেবের (সন্যাসী) কাছে বর্ণনা করেন। তখন সন্ন্যাসী বহীরা তঁ াকে জিজ্ঞেস করে যে, আপনি কোথা হতে এসেছেন? তিনি (রা.) বলেন, মক্কা থেকে। তিনি জিজ্ঞেস করেন মক্কার কোন গোত্র থেকে? তিনি উত্তরে বলেন, কুরাইশ গোত্র থেকে। তিনি জিজ্ঞেস করে, আপনি কী করেন? তিনি উত্তরে বলেন, আমি ব্যবসায়ী। তখন সন্ন্যাসী বহীরা বলেন, 'আল্লাহ তা'লা আপনার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করলে আপনাদের গোত্রের মধ্যে থেকে একজন নবীর আগমন ঘটবে।

আপনি সেই নবীর জীবদ্দশাতেই তাঁর সাহায্যকারী হবেন আর তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর খলীফা হবেন'। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) এই কথা গোপন রাখেন যতদিন না মহানবী (সা.)-এর অভ্যুদয় ঘটে। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি যে দাবি করছেন এর সপক্ষে দলীল কী? অন্যান্য রেওয়ায়েতে কোন দলীল চাওয়ার উল্লেখ নেই, যাহোক, এই রেওয়ায়াতে এটি বর্ণিত হয়েছে। মহানবী (সা.) বলেন, সেই স্বপ্ন যা তুমি সিরিয়ায় দেখেছিলে, সেটাই (এর) প্রমাণ। এতে হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-কে আলিঙ্গান করেন এবং তাঁর কপালে চুমু খান আর বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহ্ তা'লার রসূল। (সুবুলুল হুদা, ১ম খণ্ড, পৃ: ১২৯)

এই রেওয়ায়েতে হযরত আবু বকর (রা.)-এর একটি স্বপ্নের উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু তার বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়া হয়নি যে, সেই স্বপ্নে হযরত আবু বকর (রা.) কী দেখেছিলেন। কিন্তু সীরাতে হালবিয়া থেকে জানা যায়, এটি সেই স্ব প্নের দিকেই ইঙ্গিত করছেযাতে হযরত আবু বকর (রা.) দেখেছিলেন যে, চাঁদ খণ্ডবিখণ্ড হয়ে পতিত হয়েছে, যার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। এ পর্যায়ে হযরত আবু বকর (রা.) এই স্বপ্নটি সন্ন্যাসী বহীরার কাছে বর্ণনা করেছিলেন। (আস সীরাতুল হালবিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৯১)

যাহোক, এ সংক্রান্ত আরো অনেক বর্ণনা জীবনী লেখকরা লিখেছেন যা ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে।

২০১৩ (সেপ্টেম্বর) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর নিউজিল্যাণ্ড সফর

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: তরবিয়্যতী বিভাগে এম.টি.এ-র সেক্রেটারী এবং ইশা'ত-এর সেক্রেটারি একত্রে প্রোগ্রাম তেরী করে এবং খোঁজ নিয়ে দেখতে পারে যে, এই সপ্তাহে বা এই মাসে এম.টি.এ-তে কি কি অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে, এগুলির মধ্যে কোন কোনটি তাদের জন্য উপযোগী হতে পারে এবং লাজনাদেরকে দেখানো যেতে পারে। যারা উর্দু বোঝে না তাদেরকে ইংরেজিতে শোনানোর ব্যবস্থা করুন। যারা এখানকার স্থানীয় ভাষা জানে তাদেরকে এই দলের অন্তর্ভুক্ত করুন। এই কাজের জন্য টিম তৈরী করুন যাতে আপনাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

সদ্য যৌবনে পদার্পণকারী যুবক ও যুবতী উভয়কেই যেন মহিলরাই নিয়ন্ত্রণ করেন। পুরুষ এ কাজ করতে অক্ষম। এই কারণেই আঁ হযরত (সা.) তরবিয়্যতের বিষয়টি মহিলাদের দায়িত্বে অর্পন করেছেন। তিনি (সা.) বলেছেন, মায়েদের পায়ের নীচে জান্নাত রয়েছে, এটি তরবীয়তের কারণেই বলেছেন। আর শুধুমাত্র মেয়েদের তরবীয়তের কারণে বলেন নি বরং ছেলেদের তরবীয়্যতের কারণেও বলেছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সদর লাজনা এবং তরবীয়ত সেক্রেটারীর কাজ হল প্রথমে সমস্যাকে ভাল করে বোঝা এবং কিভাবে তার সমাধান করা যায় তার চিন্তা করা। যদি আপনারা নিজেদের ছেলেমেয়েদের এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে এম.টি.এ.-র প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেন তাহলে তরবীয়তের অর্ধেক কাজ বাড়িতে বসেই সম্পন্ন হয়ে যায়।

এর পর হুযুর আনোয়ার (আই.) নাসেরাতের সেক্রেটারির নিকট নাসেরাতের সংখ্যা জানতে চাইলে সেক্রেটারি সাহেবা বলেন যে, মোট ৩৪ জন নাসেরাত আছে। হুযুর নির্দেশ দিয়ে বলেন যে, তাদের জন্য ওয়াকফে নও-এর পাঠক্রমই যথেষ্ট। বর্তমানে ২১ বছর পর্যন্ত মেয়েদের জন্য পাঠক্রম তৈরী হয়ে গেছে। যদি এটি সমস্ত লাজনাদেরকে পড়ানো হয় তবে তা সকলের জন্যই যথেষ্ট।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: বাচ্চাদের জন্য আগ্রহের উপকরণ তৈরী করুন। আপনারা নিজেদের প্রতিবেশী দেশের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। সেখান থেকে লাজনা ও নাসেরাতের দল লন্ডনে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসে। আপনারাও লন্ডন আসার প্রোগ্রাম তৈরী করুন। মেয়েদের মায়েদের সঙ্গে মিটিং করুন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কথা বলার সময় বিনম্রতা অবলম্বন করুন। কুরআন করীমেও আল্লাহ তা'লা বিনম্রতা সহকারে কথা বলার আদেশ দিয়েছেন।

এর পর হুযুর আনোয়ার (আই.) কারিগরি শিক্ষা বিষয়ক সেক্রেটারি-কে নির্দেশ দিয়ে বলেন মেয়েদেরকে হস্তশিল্পের কাজ শেখান।

হুযুর আনোয়ার (আই.) সেক্রেটারি খিদমতে খালক-কে হিদায়ত দিয়ে বলেন, বড় মেয়েদেরকে ভাষা শেখান এবং তাদেরকে বয়স্ক মহিলাদের কাছে নিয়ে যান। তাদের খবরাখবর জিজ্ঞাসা করুন। এই ভাবে তাদের কথা শুনে তারাও সেই ভাষা রপ্ত করে ফেলবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি যে আপনাদেরকে বিভিন্ন নির্দেশনা দিচ্ছি এগুলির ক্ষেত্রে অবহেলা করবেন না। শিক্ষিত মেয়েদেরকে নিজেদের সঙ্গে সামিল করুন। এবং এখানকার যারা এখানকার স্থানীয় ভাষা জানে তাদেরকে এই কাজে নিযুক্ত করুন।

শরীরচর্চা বিভাগের সেক্রেটারী কে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, লাজনাদেরকে সক্রিয় করুন। খেলাধূলার জন্য জায়গার ব্যবস্থা করুন। যদি লাজনাদের হলঘর থাকে তবে সেখানে টেবিল টেনিস খেলার ব্যবস্থা করুন। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: প্রত্যেক সেক্রেটারীর একটি লক্ষ্য আছে, এবং কিছু কর্তব্য আছে। তাদের যথারীতি কর্মসূচি থাকা উচিত। এর পর হুযুর আনোয়ার (আই.) সেক্রেটারি যিয়াফত-কে তাঁর বিভাগ এবং কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) সেক্রেটারী তাজনীদ-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, ডেনমার্কে লাজনা এবং নাসেরাতের মোট সংখ্যা ২৩৯। অনুরূপভাবে সেক্রেটারী ইশা'ত বলেন যে, ডেনমার্কে প্রকাশনার বিশেষ কোন কাজ নেই। কোন পুস্তকাদি নিতে হলে তা বাইরে থেকে নিয়ে আসা হয়।

রিপোর্ট উপস্থাপনকারী বলেন যে, তিনি সেক্রেটারী মালের সঙ্গে রসিদ গুলি নিরীক্ষণের কাজ করেন।

সেক্রেটারী মাল তার রিপোর্ট পেশ করে বলেন, আমাদের বাৎসরিক বাজেট ৫৬ হাজার ক্রোনার এবং বাৎসরিক ইজতেমার বাজেট ৯ হাজার ক্রোনার।

এর পর হুযুর আনোয়ার (আই.) সেক্রেটারী তবলীগকে বলেন যে, এখানে আরব অভিবাসীরাও রয়েছেন, সিরিয়ার মানুষও আছেন এবং পুরোনো মানুষও আছেন। (ক্রমশ..)

জুমআর খুতবা

মহানবী (সা.) বলেছেন, আমি যাকেই ইসলামের প্রতি আহ্বান করেছি সে হোঁচট খেয়েছে ও দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়েছে এবং অপেক্ষা করেছে, কেবল আবু বকর ব্যতীত। আমি যখন তাঁর কাছে ইসলামের উল্লেখ করি তখন তিনি তা থেকে পিছু হটেন নি এবং এ সম্পর্কে দ্বিধাদ্বন্দ্বেও ভোগেন নি। [হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]

সকল যুগে যে ব্যক্তি সিদ্দীকের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চায় তার জন্য আবশ্যক আবু বকর (রা.)-এর বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি নিজের মাঝে ধারণ করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা আর এরপর যতটা সম্ভব দোয়া করা। যতক্ষণ না আবু বকর সুলভ প্রকৃতির ছাপ গ্রহণ করবে এবং সেই রঙে রঙিন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সিদ্দিকী উৎকর্ষ অর্জিত হতে পারে না। [হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী দ্বিতীয় খলীফায়ে রাশেদ সিদ্দীকে আকবার হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত** ১০ ডিসেম্বর, ২০২১, **এর জুমুআর খুতবা (১০ ফাতাহ, ১৪০০ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত আবু বকর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। এ সম্পর্কে কিছু কথা উপস্থান করা এখনও বাকী আছে। কিছু কথা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রয়েছে, তাই বর্ণনা করা হয়, আপাতদৃষ্টিতে সেগুলোকে একই ঘটনা বলে মনে হয়। কিছু (এমন কথা) এখন আমি বর্ণনা করব। উসদুল গাবাহ্ পুস্তকেহযরত আবু বকর (রা.)'র ইসলামগ্রহণের ঘটনার উল্লেখ এভাবে রয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে একবার ইয়েমেন যাই আর আয্দ গোত্রের এক বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির (বাড়িতে) আতিথেয়তা গ্রহণ করি। এই ব্যক্তি একজন আলেম ছিল, ঐশী গ্রন্থাবলীর জ্ঞান ছিল। আর মানুষের বংশবৃক্ষ বা বংশতালিকা সম্পর্কিত জ্ঞানে সে পারদশী ছিল। আমাকে দেখে সে বলে, আমার ধারণা হলো তুমি হেরেমের বা মক্কার অধিবাসী। আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি মক্কার অধিবাসী। অতঃপর সে বলে, তোমাকে আমি কুরাইশ গোত্রীয়বলে মনে করি। আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি কুরাইশদের অন্তর্ভুক্ত। এরপর সে বলে, আমি তোমাকে তায়েমীবলে মনে করি। আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি তায়েম বিন মুররাহ্ গোত্রের সদস্য, আমি হলাম আব্দুল্লাহ্ বিন উসমান আর ক্বাব বিন সা'দ বিন তায়েম বিন মুররাহ্'র সন্তান। এখানে এই নাম বলা যে, আব্দুল্লাহ্ বিন উসমান, আমার মনে হয় মহানবী (সা.) তখনও তার নাম আব্দুল্লাহ্ রাখেন নি। যাহোক রেওয়ায়েত হলো,আমার কাছে তোমার সম্পর্কে এখন কেবল একটি বিষয় বাকি আছে। আমি বললাম, তা কী? সে বলে, তুমি তোমার পেটের ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে দেখাও। আমি বললাম, তুমি এটি কেন দেখতে চাইছ তা না বলা পর্যন্ত আমি এমনটি করব না। সে বলে, আমি সঠিক এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানে বুঝতে পারছি যে, একজন নবী হারাম শরীফে আবির্ভূত হবেন। এক যুবক এবং একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তাঁর কাজে তঁাকে সাহায্য করবে। যতদূর যুবকের সম্পর্ক রয়েছে, সে বিপদাপদে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং দুশ্চিন্তা নিরসনকারীহবে। বয়স্ক, ফর্সা এবং হালকা-পাতলা গড়নের হবে। তার পেটে তিল থাকবে। আর তার বাম উরুতেএকটি চিহ্ন থাকবে। সে বলে তোমার জন্য আবশ্যক নয় যে, তুমি আমাকে তা দেখাবে যা আমি তোমার কাছে (দেখতে) চেয়েছি। তোমার মাঝে উপস্থিত বাকি সকল বৈশিষ্ট্য আমার জন্য পূর্ণ হয়ে গেছে, একটি ব্যতিরেকে, যা আমার অজানা। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তখন আমি তার জন্য আমার পেটের ওপর থেকে কাপড় সরালে সে আমার নাভির ওপর কালো তিল দেখতে পায় এবং বলে, কা'বার প্রভুর কসম! তুমিই সেই ব্যক্তি। আমি তোমার সামনে একটি বিষয় উপস্থাপন করতে যাচ্ছি। অতএব, তুমি এই বিষয়ে সতর্ক থেকো। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তা কী। সে বলে, সাবধান, হিদায়াতকে অবজ্ঞা করো না আর আদর্শিক ও সর্বোৎকৃষ্ট পথকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রেখো। আর খোদা তা'লা তোমাকে যে ধনসম্পদ দান করবেন সে সম্পর্কে খোদা তা'লাকে ভয় করতে থেকো। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, আমি ইয়েমেনে নিজের কাজ সম্পন্ন করি। এরপর সেই বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে বিদায় জানানোর জন্য তার কাছে গেলে সে বলে, তুমি কি আমার এই পঙক্তিগুলো মুখস্থ করবে যেগুলো আমি সেই নবীর প্রশংসায় রচনা করেছি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন সে কয়েকটি পঙক্তি শোনায়। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, এরপর আমি মক্কায় ফিরে আসি। আর ততদিনে মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাব হয়ে গিয়েছিল। এরপর উতবা বিন আবি মুআয়েদ, শায়বা, রবিআ, আবু জাহল, আবু বাখতারি এবং কুরাইশদের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ আমার কাছে আসে। আমি তাদেরকে বলি, তোমাদের ওপর কি কোন বিপদ নেমে এসেছে, নাকি কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেছে যে, (তোমরা সবাই) দলবেঁধে উপস্থিত হয়েছ? তারা বলে, হে আবু বকর! অনেক বড় ঘটনা ঘটে গেছে। আবু তালেব এর এতীম (ভাতিজা) নবী হওয়ার দাবি করছে। আপনি না হলে আমরা তাঁর বিষয়ে (সিদ্ধান্ত গ্রহণে) কোন বিলম্ব করতাম না। এখন আপনি যেহেতু এসে গেছেন তাই এখন এ বিষয়ে আপনিই আমাদের আশা-ভরসা এবং আমাদের জন্য যথেষ্ট। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি তাদেরকে ভালোভাবে বুঝিয়ে-শুনিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিই আর মহানবী (সা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আমাকে বলা হয়, তিনি খাদীজা (রা.)'র বাড়িতে অবস্থান করছেন। আমি (সেখানে) গিয়ে দরজার কড়া নাড়ি। তিনি (সা.) বাইরে বেরিয়ে আসেন। এরপর আমি বলি, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি কি আপনার পারিবারিক গৃহ পরিত্যাগ করেছেন আর আপনার পিতৃপুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ করেছেন? মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু বকর! আমি আল্লাহ্র রসূল, তোমার প্রতিও এবং সমগ্র মানবজাতির প্রতিও। অতএব, তুমি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনয়ন কর। আমি বলি, (এই) দাবির সপক্ষে আপনার কাছে কী প্রমাণ আছে? মহানবী (সা.) বলেন, (প্রমাণ হলো) সেই বৃদ্ধ যার সাথে তুমি ইয়েমেনে সাক্ষাৎ করেছিলে। আমি বললাম, ইয়েমেনে তো অনেক বৃদ্ধ মানুষ ছিল; যাদের সাথে আমি সাক্ষাৎ করেছি। মহানবী (সা.) বলেন, সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি, যিনি তোমাকে (কবিতার) পঙ্ক্তি শুনিয়েছিলেন। (এরপর) আমি নিবেদন করি, হে আমার প্রিয় বন্ধু ! আপনাকে এই সংবাদ কে দিয়েছে? মহানবী (সা.) বলেন, সেই মহান ফিরিশ্তা; যিনি আমার পূর্ববর্তী নবীদের কাছেও আসতেন। আমি নিবেদন করি, আপনি আপনার হাত বাড়িয়ে দিন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে; আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই আর আপনি আল্লাহ্র রসূল। হযরত আবু বকর (রা.) বলতেন, এরপর আমি ফিরে যাই আর আমার ইসলাম গ্রহণ করার ফলে মক্কার দুই পাহাড়ের মাঝে মহানবী (সা.)-এর চেয়ে বেশি আনন্দিত আর কেউ হয় নি।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১২,৩১৩)

এটি উসদুল গাবাহ্'র উদ্ধৃতি।হতে পারে কোন কোন জায়গায় গল্প সাজানোর জন্য অনেকে বাড়িয়েও বলে, কিন্তু অনেক কথা সঠিকও হবে (হয়ত)।

রিয়াযুন নাযরা'তে হযরত আবু বকর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনাটি এভাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক(রা.) মহানবী (সা.)-এর ঘনিষ্ট ও নিষ্ঠাবান বন্ধু ছিলেন। তিনি (সা.) যখন (নবী হিসেবে) আবির্ভূত হন

তখন কুরাইশ হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছে আসে আর বলে, হে আবু বকর! তোমার এই বন্ধু উন্মাদ হয়ে গেছে, নাউযুবিল্লাহ্। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, ঘটনা কী? তখন তারা বলে, সে মসজিদে হারামে মানুষকে তৌহীদ অর্থাৎ, এক খোদার দিকে আহ্বান জানায় আর বলে, সে (নাকি) নবী! হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, তিনি কি সত্যিই একথা বলেছেন? (অর্থাৎ নবুয়্যতের দাবি করেছেন?) মানুষ বলে, হঁ্যা, আর এই কথা তিনি মসজিদে হারামে (বসে) বলছেন। তখন হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর (বাড়ির) উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং তাঁর দরজার কড়া নাড়েন, তাঁকে বাইরে ডাকেন। তিনি (সা.) যখন তঁ ার সামনে আসেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে আবুল কাসেম! আপনার সম্পর্কে আমি এ-কি শুনছি? মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু বকর! আমার সম্পর্কে তুমি কি শুনেছ? হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি শুনেছি, আপনি আল্লাহ্র তৌহীদ বা একত্ববাদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন আর আপনি বলছেন, আপনি (নাকি) আল্লাহ্র রসূল? মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু বকর! হ্যাঁ; নিশ্চয় আমার মহাপ্রতাপান্বিত ও সম্মানিত খোদা আমাকে বশীর ও নাযীর (অর্থাৎ, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী) বানিয়েছেন। আর আমাকে ইব্রাহীম (আ.)-এর প্রার্থনার প্রতিফল বানিয়েছেন, এবং আমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেরণ করেছেন। হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-কে বলেন, আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি! আমি আপনাকে কখনও মিথ্যা বলতে দেখিনি বা শুনিনি। আপনি নিশ্চয় আপনার আমানতের মর্যাদা রক্ষা, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা এবং উত্তম কর্মকাণ্ডের দরুন নবুয়্যতের অধিক যোগ্য। আপনার হাত বাড়িয়ে দিন যাতে আমি আপনার হাতে বয়আত করতে পারি, তখন মহানবী (সা.) নিজের হাত বাড়িয়ে দেন এবং হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর হাতে বয়আত করেন আর তাঁর সত্যয়ন করেন ও স্বীকার করেন যে, আপনি যা নিয়ে এসেছেন তা সত্য। আল্লাহ্র কসম! যখন মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানান তখন তিনি কোন প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও কালবিলম্ব করেন নি।

(আররিয়াযুন নাযরা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮৪-৮৫)

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, আমি যাকেই ইসলামের প্রতি আহ্বান করেছি সে হোঁচট খেয়েছে ও দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়েছে এবং অপেক্ষা করেছে, কেবল আবু বকর ব্যতীত। আমি যখন তাঁর কাছে ইসলামের উল্লেখ করি তখন তিনি তা থেকে পিছু হটেন নি এবং এ সম্পর্কে দ্বিধাদ্বন্দ্বেও ভোগেন নি। (উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২০৫ ও ২০৫)

মহানবী (সা.) বলেন, হে লোকসকল! আল্লাহ্ আমাকে তোমাদের প্রতি প্রেরণ করেছেন আর তোমরা আমাকে বলেছ, তুমি মিথ্যাবাদী আর আবু বকর বলেছেন, (তুমি) সত্যবাদী এবং তিনি তাঁর প্রাণ ও সম্পদ সবকিছু দিয়ে আমার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন। (সহী বুখারী, কিতাবু ফাযাইলি আসহাবিন নাবী, হাদীস-৩৬৬১) এটি বুখারীর বর্ণনা।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণের ঘটনা একস্থানে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, "মহানবী (সা.) যখন নবুয়্যতের দাবি করেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) (মক্কার) বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন। ফিরে আসার পর তঁ ার (রা.) এক দাসী তঁ াকে বলে, আপনার বন্ধু (নাউযুবিল্লাহ্) উন্মাদ হয়ে গেছে এবং সে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলছে। সে বলে, আমার প্রতি উর্ধ্বলোক থেকে ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হয়। হযরত আবু বকর (রা.) তখনই উঠে পড়েন এবং মহানবী (সা.)-এর বাড়িতে গিয়ে তাঁর (সা.) দরজায় কড়া নাড়েন। মহানবী (সা.) বাইরে আসেন। তখন হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, আমি আপনাকে শুধু একটি কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি। আপনি কি একথা বলেছেন যে, আপনার প্রতি খোদার ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হয় এবং আপনার সাথে কথা বলে। তিনি (রা.) কোথাও হোঁচট না খান-একথা ভেবে মহানবী (সা.) বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে উদ্যত হন। আমাদের ইতিহাসে সাধারণত এ বর্ণনাটিই অধিক প্রচলিত। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই, আমাকে শুধু এতটুকু বলুন যে, আপনি একথা বলেছেন কি-না? মহানবী (সা.) পুনরায় এটি ভেবে যে, হয়ত তিনি (রা.) প্রশ্ন করবেন, ফিরিশ্তাদের আকৃতি কেমন হয়ে থাকেন এবং তারা কীভাবে অবতীর্ণ হয়? (তাই) প্রথমে ভূমিকাস্বরূপ কিছু কথা বলতে প্রয়াসী হন, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) পুনরায় বলেন, না, আপনি শুধু এটি বলুন যে,একথা সত্য কি-না? তখন তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, সত্য। তখন হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, আমি আপনার প্রতি ঈমান আনলাম। অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আমি দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনে যে বাধা দিয়েছি তার কারণ হলো, আমি চাচ্ছিলাম আমার ঈমান যেন অভিজ্ঞতালব্ধ হয়, এর ভিত্তি যেন দলিল-প্রমাণ নির্ভর না হয়। কেননা, আপনাকে সত্যবাদী ও সৎ হিসেবে মেনে নেয়ার পর কোন দলিল-প্রমাণের প্রয়োজন থাকে না। মোটকথা, মক্কাবাসীরা যে কথা গোপন করেছিল সেটিকে হযরত আবু বকর (রা.) স্বীয় কর্মের মাধ্যমে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেন। "

(তফসীরে কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫১-২৫২)

অপর একস্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন, " যেহেতু সেটি ভিন্ন বরাতে বর্ণনা করছেন তাই এর বিবরণ একটু ভিন্ন আর তাহলো,হযরত আবু বকর (রা.)'র ইসলামগ্রহণের বিষয়টি বড়ই বিস্ময়কর। যখন মহানবী (সা.)-এর প্রতি নবুয়্যতের দাবি করার নির্দেশ সম্বলিত ওহী হয় তখন হযরত আবু বকর (রা.) মক্কার এক নেতার বাড়িতেবসা ছিলেন। সেই নেতার দাসী এসে বলে, জানিনা খাদীজার কী হয়েছে। সে বলছে, আমার স্বামী সেভাবেই নবী যেমনটি ছিলেন হযরত মূসা (আ.)। মানুষ এই সংবাদ শুনে হাসাহাসি করতে থাকে এবং এরূপ কথা যারা বলে তাদেরকে উন্মাদ আখ্যায়িত করতে থাকে, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.), যিনি মহানবী (সা.)-এর অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন, তৎক্ষণাৎ উঠে মহানবী (সা.)-এর দ্বারে আসেন এবং জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি কোন দাবি করেছেন? তিনি (সা.) বলেন, হঁ্যা। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে পৃথিবীবাসীর সংশোধনের জন্য আবির্ভূত করেছেন এবং শিরক দূর করার আদেশ দিয়েছেন। হযরত আবু বকর (রা.) অন্য কোন প্রশ্ন না করে উত্তর দেন, আমি আমার পিতা -মাতার শপথ করে বলছি, আপনি কখনও মিথ্যা বলেন নি আর আমি মানতেই পারি না যে, আপনি আল্লাহ্ সম্পর্কে কোন মিথ্যা বলবেন, তাই আমি ঈমান আনছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই আর আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র রসূল। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) এমন যু বকদের সমবেত করে বুঝাতে শুরু করেন যারা তাঁর অর্থাৎ আবু বকর (রা.)'র পুণ্য এবং তাকওয়ায় বিশ্বাসী ছিলেন, ফলে আরও সাতজন মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনেন আর তারা সবাই ছিলেন যুবক যাদের বয়স ছিল ১২ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে।"

(ইউরোপ সফর, আনোয়ারুল উলুম, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৫৪৩-৫৪৪)

আরেক জায়গায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ঘটনাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-কে একটি প্রমাণের ভিত্তিতে মেনেছেন। তাঁর (রা.) হৃদয়ে এক মুহূর্তের তরেও সন্দেহ জাগে নি। প্রমাণ সেটিই কিন্তু ঘটনার বর্ণনা কোন কোন স্থানে একটু ভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত হয়। সেই প্রমাণটি হলো, তিনি মহানবী (সা.)-কে আশৈশব দেখে এসেছেন এবং তিনি জানতেন যে, মহানবী (সা.) কখনও মিথ্যা বলেন নি, কখনও কোন দুষ্কৃতি করেন নি আর কখনও নোংরা ও অপবিত্র কথা তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হয় নি। তিনি কেবল এতটুকুই জানতেন, এর বাইরে তিনি কোন শরীয়তকেও জানতেন না; যাতে উল্লিখিত মাপকাঠি অনুযায়ী তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-কে সত্য জ্ঞান করবেন, আর তিনি (রা.) কোন বিধানেরও অনুসারী ছিলেন না। তাঁর (রা.) জানাই ছিল না যে, আল্লাহ্র রসূল কী এবং তাঁর সত্যতার প্রমাণ ই বা কী! তিনি কেবল এতটুকুই জানতেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) কখনও মিথ্যা বলেন নি। তিনি (রা.) কোন এক সফরে গিয়েছিলেন, ফেরার সময় পথিমধ্যেই কেউ তাঁকে বলে যে, তোমার বন্ধু মুহাম্মদ (সা.) দাবি করেছে যে, সে আল্লাহ্র রসূল। তিনি (রা.) জিজ্ঞেস করেন, সত্যিই কি তিনি (সা.) এই দাবি করেছেন? সেই ব্যক্তি বলে, হ্যাঁ। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তিনি (সা.) কখনও মিথ্যা বলেন না, তিনি যা-ই বলেন, সত্য বলেন। যিনি বান্দা সম্পর্কে কখনও মিথ্যা বলেন নি, তিনি আল্লাহ্ সম্পর্কে কীভাবে মিথ্যা বলতে পারেন?

যেখানে তিনি মানুষের ক্ষেত্রে কোন তুচ্ছ অসৎ পন্থা অবলম্বন করেন নি, সেখানে এখন কীভাবে এত ঘৃণ্য অসৎ পন্থা অবলম্বন করতে পারেন যে, তাদের আত্মাকে ধ্বংস করে দেবেন। কেবলমাত্র এই প্রমাণের ভিত্তিতে হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন আর এটি সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মানুষকে বলে দাও- فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (সূরা ইউনুস: ১৭) অর্থাৎ, দীর্ঘকাল আমি তোমাদের মাঝে বসবাস করেছি আর তোমরা দেখেছ, আমি কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করি নি, এখন আল্লাহ্র সাথে কীভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি? হযরত আবু বকর (রা.) এই প্রমাণটিই নিয়েছেন এবং বলেছেন, তিনি (সা.) যদি বলে থাকেন যে, তিনি আল্লাহ্র রসূল তাহলে তিনি সত্য বলেছেন এবং আমি তাঁর (সা.) প্রতি ঈমান আনছি। এরপর আবু বকর (রা.)'র হৃদয়ে কখনও কোন সন্দেহ জাগে নি এবং তিনি আর কখনও দোদুল্যমানও হন নি। তিনি বড় বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন, ধনসম্পদ এবং স্বদেশ ত্যাগ করতে হয়েছে এবং আত্মীয়স্ব জনদের হত্যা করতে হয়েছে কিন্তু মহানবী (সা.)-এর সত্যতার বিষয়ে তাঁর (রা.) হৃদয়ে কখনও (কোন) সন্দেহের উদ্রেক হয় নি।"

(বয়আত করনে ওয়ালে কে লিয়ে হিদায়ত, আনোয়ারুল উলুম, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৭৬-৭৭)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)} একবার বয়আতকারীদের পথনির্দেশ দিচ্ছিলেন, তাদেরকে বুঝাচ্ছিলেন আর এই বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনার ক্ষেত্রে হযরত আবু বকর (রা.)'র ঘটনা তুলে ধরেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে যে সিদ্দীক উপাধি দিয়েছেন, সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন যে, তাঁর (রা.) মাঝে কী কী উৎকর্ষ (গুণাবলী) ছিল। মহানবী (সা.) এ কথাও বলেছেন, হযরত আবু বকর (রা.)'র শ্রেষ্ঠত্বের কারণ সেটিই যা তাঁর (রা.) হৃদয়ে বিরাজমান। আর যদি গভীর অভিনিবেশ সহকারে দেখা যায় তাহলে উপলব্ধি হয় যে, সত্যিকার অর্থেই হযরত আবু বকর (রা.) যে সততা দেখিয়েছেন, এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার। আর সত্য কথা হলো, সকল যুগে যে ব্যক্তি সিদ্দীকের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চায় তার জন্য আবশ্যক হলো, আবু বকর (রা.)'র বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি নিজের মাঝে ধারণ করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা আর এরপর যতটা সম্ভব দোয়া করা। যতক্ষণ পর্যন্ত আবু বকরসুলভ প্রকৃতির ছাপ গ্রহণ না করবে এবং সেই রঙে রঙিন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সিদ্দিকী উৎকর্ষ অর্জিত হতে পারে না। "

অতঃপর বলেন, "আবু বকরসুলভ প্রকৃতি কী? সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও কথা বলার সুযোগ এখানে নেই, কেননা এটি সবিস্তারে বর্ণনা করার জন্য দীর্ঘ সময় প্রয়োজন। তিনি (আ.) বলেন, আমি সংক্ষেপে একটি ঘটনা বর্ণনা করে দিচ্ছি এবং তা হলো, মহানবী (সা.) যখন নবুয়্যতের দাবি করেন, সে সময় হযরত আবু বকর (রা.) বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিরিয়া গিয়েছিলেন। পথিমধ্যেই তাঁর সাথে জনৈক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি (রা.) তাকে মক্কার খবরাখবরসম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন এবং নতুন কোন সংবাদ আছে কিনা জানতে চান। রীতি হলো, মানুষ যখন ভ্রমণ শেষে ফেরত আসে তখন পথিমধ্যে কোন স্বদেশীর সাথে সাক্ষাৎ হলে তার নিকট নিজ দেশের খবরাখবরসম্পর্কে জিজ্ঞেস করে থাকে। সেই ব্যক্তি উত্তর প্রদান করে যে, নতুন বিষয় হলো, তোমার বন্ধু মুহাম্মদ (সা.) নবুয়্যতের দাবি করেছে। হযরত আবু বকর (রা.) একথা শোনামাত্রই বলেন, যদি তিনি এই দাবিকরে থাকেন তবে নিঃসন্দেহে তিনি সত্য।

এই একটি ঘটনা থেকেই প্রমাণ হয়ে যায় যে, মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাঁর কীরূপ সুধারণা ছিল। নিদর্শন দেখারও প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি। সত্য কথা হলো,নিদর্শন সে ব্যক্তিই দাবি করে যে দাবিকারকের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অনবহিত থাকে এবং অপরিচিত ও অজানা থাকে এবং অধিক পরিচিতির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত আছে তার জন্য নিদর্শন দেখার কী প্রয়োজন! বস্তুত হযরত আবু বকর (রা.) পথিমধ্যেই মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যতের দাবি শুনে ঈমান আনেন। এরপর মক্কায় পৌঁছে মহানবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, আপনি কি নবুয়্যতের দাবি করেছেন? মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ, একথা সত্য। একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি আপনার প্রথম সত্যায়নকারী। তঁার (রা.) এরূপ বলা কেবল বুলিসর্বস্ব ছিল না বরং তিনি অর্থাৎ, হযরত আবু বকর (রা.) নিজ কর্মদ্বারা তা সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছেন এবং আমৃত্যু সেই অঙ্গীকার রক্ষা করেছেন, এমনকি মৃত্যুর পরও (তাঁর) সঙ্গ ত্যাগ করেন নি।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৭২-৩৭৪)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সূরা রহমানের আয়াত, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ (সূরা আর্ রহমান: ৪৭) অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার প্রভুর পদমর্যাদাকে ভয় করে তার জন্য দু 'টি জান্নাত রয়েছে- এই আয়াতের তফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আবু বকর (রা.)'র উদাহরণ দেন এবং বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীককেই দেখ! যখন তিনি সিরিয়া থেকে ফেরত আসছিলেন তখন পথিমধ্যে এক ব্যক্তির সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, কোন নতুন সংবাদ শোনাও। সেই ব্যক্তি উত্তর দেয় কোন নতুন সংবাদ নেই তবে তোমার বন্ধু নবুয়্যতের দাবি করেছে। এতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) তাকে উত্তর প্রদান করেন যে, যদি তিনি (সা.) নবুয়্যতের দাবি করে থাকেন তবে তিনি (সা.) সত্য বলেছেন। তিনি (সা.) কখনও মিথ্যাবাদী হতে পারেন না। এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) সোজা মহানবী(সা.)-এর গৃহে চলে যান এবং মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমিই সর্বপ্রথম আপনার প্রতি ঈমান আনয়নকারী। দেখুন! তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর নিকট কোন নিদর্শন (দেখানোর) দাবি করেন নি। শুধুমাত্র পূর্ব পরিচিতির কল্যাণেই তিনি ঈমান নিয়ে এসেছিলেন। স্মরণ রাখবে, নিদর্শনের দাবি কেবল তারাই করে যারা পরিচিতি রাখে না।

যে শৈশবের বন্ধু , তার জন্য অতীতের অবস্থাই নিদর্শন হয়ে থাকে। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) অনেক কঠিন অবস্থার মোকাবিলা করেছেন, অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন। সবচেয়ে বেশি কষ্ট তাঁকে (রা.) দেওয়া হয়েছে। আর তাঁকেই সবচেয়ে বেশি নির্যাতন করা হয়েছে, তাই তাঁকেই সর্বপ্রথম নবু য়্যতের সিংহাসনে সমাসীন করা হয়েছে। আল্লাহ্তা'লা এ জগতেই তঁ াকে পু রস্কারে ভূষিত করেছেন আর পরকালে তো জান্নাত রয়েছেই। কোথায় সেসব ব্যবসা-বাণিজ্য যেখানে দিনভর তঁ াকে কষ্ট করতে হয়েছে আর কোথায় এই পদমর্যাদা অর্থাৎ, তঁ াকেই মহানবী (সা.)-এর পর প্রথম খলীফা হিসেবে নিযু ক্ত করা হয়েছে।"

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৭৮-৭৯)

অপর একস্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন," মানুষ দু 'ধরনের হয়ে থাকে। প্রথম হচ্ছে সেসব পুণ্যাত্মা, যারা সূচনাতেই মেনে নেন আর বিচক্ষণ ও দূরদর্শী হয়ে থাকেন যেমন ছিলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ছিলেন। আর আরেক প্রকার হলো, নির্বোধ লোক। মাথায় যখন কোন বিপদ এসে পড়ে তখন সম্বিৎ ফিরে পায় ।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৬১)

অর্থাৎ, যখন কোন বিপদে পড়ে, আযাব আসে, তখন ভাবে যে, মানা উচিত কি না?

মহানবী (সা.)-এর প্রতি সর্বপ্রথম কে ঈমান এনেছিলেন- তা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। পুরুষদের মধ্যে কে প্রথম বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.), হযরত আলী (রা.) নাকি হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.)?

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ,২য় খণ্ড, পৃ: ৩০০-৩০৪) (তারিখুত তাবারী,১ম খণ্ড, পৃ: ৫৩৭-৫৪০)

কেউ কেউ এই সমাধান বের করেছেন যে, বালকদের মধ্যে আলী (রা.) প্রথম, প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে আবু বকর (রা.) এবং ক্রীতদাসদের মধ্যে যায়েদ (রা.) প্রথম ঈমান আনয়নকারী ছিলেন। আল্লামা আহমদ বিন আব্দু ল্লাহ্ এসব রেওয়ায়েতের মাঝে সামঞ্জস্য স্থাপন করে লিখেন,হযরত খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রা.) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। পু রুষদের মাঝে সর্বপ্রথম হযরত আলী (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন যদিও তিনি তখন বালক ছিলেন, যেভাবে তাঁর বয়স সম্পর্কে পূর্বেও উল্লেখ হয়েছে যে, তঁ ার বয়স দশ ছিল বছর আর তিনি তঁ ার ইসলাম গ্রহণ গোপন রেখেছিলেন। আর সর্বপ্রথম প্রাপ্তবয়স্ক আরব ব্যক্তি যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন আর এ বিষয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছেন তিনি ছিলেন, হযরত আবু বকর বিন আবী কোহাফা (রা.)। মু ক্ত ক্রীতদাসদের মাঝে প্রথম ঈমান এনেছিলেন, হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)। এটি সর্বসম্মত বিষয়- যাতে কোনো দ্বিমত নেই।

(আর রিয়াযুন নাজারাতি ফি মানাকিবুল আশার, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮৯)

এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) দাবির পর যখন তাঁর ধর্ম প্রচার শুরু করেন, তখন সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী ছিলেন হযরত খাদীজা (রা.), যিনি এক মুহূর্তের তরেও দ্বিধান্বিত হন নি। হযরত খাদীজা (রা.)'র পর পুরুষদের মাঝে সর্বপ্রথম কে ঈমান এনেছেন তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন,তিনি ছিলেন হযরত আবু বকর আব্দুল্লাহ্ বিন আবী কোহাফা (রা.)। আবার কেউ কেউ বলেন, হযরত আলী (রা.) বা যায়েদ বিন হারেসা (রা.)। কিন্তু তিনি (রা.) লিখেছেন, আমাদের মতে এই বিতর্কঅনাবশ্যক। হযরত আলী (রা.) ও যায়েদ বিন হারেসা (রা.) মহানবী (সা.)-এর গৃহবাসী ছিলেন এবং তাঁর সন্তানদের মতই তাঁর সঙ্গে থাকতেন। মহানবী (সা.) আদেশ দিতেন আর তঁ ারা মান্য করতেন। মহানবী (সা.) যা বলতেন তা তারা বাড়ির সন্তান হিসেবে মানতেন। সম্ভবত সে সময় তারা ঈমান আনার বিষয়টিও এভাবেই শিরোধার্য করেছিলেন। এরপর তিনি (রা.) আরো লিখেন যে, এই দু ই বালককে বাদদিলে সর্বসম্মতভাবে হযরত আবু বকর (রা.) ঈমান আনার ক্ষেত্রে প্রথম এবং অগ্রগামী ছিলেন। যেমনটিনবী দরবারের কবি হাস্সান বিন সাবেত আনসারী (রা.) হযরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে বলেন,

إِذَا تَذَكَّرْتَ شَجْوًا مِنْ أَخِيْ ثِقَةٍ فَاذْكُرْ أَخَاكَ أَبَابَكْرٍ بِمَا فَعَلَا
خَيْرَ الْبَرِيَّةِ أَتْقَاهَا وَ أَعْدَلَهَا بَعْدَ النَّبِيِّ وَ أَوْفَاهَا بِمَا حَمَلَا
اَلثَّانِيَ التَّالِيَ الْمَحْمُوْدَ مَشْهَدُهٗ وَأَوَّلَ النَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الرُّسُلَا

অর্থাৎ, তোমার হৃদয়ে যখন তোমার কোন প্রিয় ভাইয়ের বেদনার স্মৃতি জাগ্র ত হবে তখন তোমার ভাই আবু বকরকেও স্মরণ করো। তাঁর সেসব গুণের কারণে যেগুলো স্মরণ রাখার যোগ্য। মহানবী (সা.)-এর পর তিনি ছিলেন সবার মধ্যে সবচেয়ে মুত্তাকী এবং সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ। এছাড়া তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্বাবলী সর্বোত্তমভাবে পালন করেছেন। হ্যাঁ তিনিই তো আবু বকর (রা.) যিনি সওর গুহায় মহানবী (সা.)-এর সাথে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন, যিনি নিজেকে তঁ ার আনুগত্যে পুরোপুরি বিলীন

করে রেখেছিলেন এবং তিনি যে কাজেই হাত দিতেন তা সুচারুরূপে সম্পন্ন করতেন। তিনি সে সব লোকের মধ্যে প্রথম ছিলেন, যিনি রসূল (সা.)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন।

হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর সততা ও যোগ্যতার কারণে কুরাইশদের মাঝে অনেক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। আর ইসলামে তিনি সেই সম্মান অর্জন করেছেন যা অন্য কোন সাহাবী অর্জন করতে পারে নি। হযরত আবু বকর (রা.) এক মুহূর্তের জন্যও মহানবী (সা.)-এর দাবির প্রতি সন্দেহ পোষণ করেন নি বরং শোনামাত্রই গ্র হণ করেছেন। এরপর তাঁর পুরো মনোযোগ এবং প্রাণ ও ধনসম্পদকে মহানবী (সা.)-এর আনীত ধর্মের জন্য উৎসর্গ করেছেন। মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.)-কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তিনিই তাঁর প্রথম খলীফা হন। নিজ খিলাফতের যুগেও তিনি তাঁর অতুলনীয় যোগ্যতার প্রমাণ রাখেন। হযরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে ইউরোপের বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ স্প্রিংগার লিখেন, ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি হযরত আবু বকর (রা.)'র ঈমান আনা এই বিষয়ের সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে, মুহাম্মদ (সা.) প্রতারিত হতে পারেন কিন্তু কখনোই প্রতারক ছিলেন না বরং নিজেকে তিনি সত্যনিষ্ঠ হৃদয়ে খোদার রসূল বিশ্বাস করতেন। স্যার উইলিয়াম মুইরও স্প্রিংগারের এই মতের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন।

(সীরাত খাতামাননাবীঈন, পৃ: ১২১-১২২)

ইসলামের তবলীগ এবং এর কারণে হযরত আবু বকর (রা.)-কে কেমন কষ্টের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতে হয়েছে সে সম্পর্কে উসদুল গাবাহ্ পুস্তকে হযরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে লেখা রয়েছে, ইসলামের আবির্ভাবের পর তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্র হণ করেন এবং তাঁর তবলীগে একদল লোক ইসলাম গ্রহণ করেন, সেই ভালোবাসার কারণে যা হযরত আবু বকর (রা.)'র প্রতি তাদের ছিল আর সেই আকর্ষণের কারণে যা হযরত আবু বকর (রা.)'র প্রতি তাদের ছিল। এমনকি আশারায়ে মুবাশ্বারা'র পাঁচজন সাহাবী তাঁর মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেন। (উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২০৫)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র তবলীগে ইসলামগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন, হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রা.), হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.), হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.), হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.), হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.)।

(সীরাত ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৬৬)

এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) তাঁর সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে লিখেন, হযরত খাদীজা (রা.), হযরত আবু বকর (রা.), হযরত আলী (রা.) এবং হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)'র পর ইসলামগ্র হণকারীদের মধ্যে পাঁচজন ছিলেন যারা হযরত আবু বকর (রা.)'র তবলীগে ঈমান এনেছিলেন আর তাঁরা প্রত্যেকে ইসলামের ইতিহাসে এমন মহিমান্বি ত ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী প্রমাণিত হয়েছেন যে, তাঁদেরকে শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের মাঝে গণ্য করা হয়। তঁ াদের নামগুলো হচ্ছে- প্রথমত হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রা.) যিনি উমাইয়া বংশদ্ভুত ছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করার সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৩০ বছর। হযরত উমর (রা.)'র পর তিনি মহানবী (সা.)-এর তৃতীয় খলীফা নির্বাচিত হন। হযরত উসমান (রা.) অত্যন্ত লাজুক, বিশ্বস্ত, কোমল হৃদয়ের অধিকারী, বদান্যশীল এবং সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি ইসলামের ব্যাপক আর্থিক সেবা করেছেন। মহানবী (সা.) হযরত উসমান (রা.)-কে কতটা ভালোবাসতেন তা এ বিষয়ের মাধ্যমেও অনুমান করা যায় যে, তিনি (সা.) তাঁর দুই কন্যাকে পর পর তঁ ার কাছে বিয়ে দেন, যার ফলে তাঁকে যুন্ নূরায়েন তথা দুই নূরের অধিকারীও বলা হয়।

দ্বিতীয়জন হলেন, আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)। তিনি বনু যোহরা গোত্রের সদস্য ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর মাতাও এ বংশেরই ছিলেন। খুবই বুদ্ধিমান ও সভ্য প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁর মাধ্যমেই হযরত উসমান (রা.)'র খিলাফতের আসনে সমাসীন হওয়ার বিষয়টি নির্ধারিত হয়েছিল। ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৩০ বছর। হযরত উসমান (রা.)'র যুগে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তৃতীয়জন হলেন, সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)। তখন তিনি টগবগে যুবক ছিলেন, অর্থাৎ তখন তাঁর বয়স কেবল ১৯ বছর ছিল। তিনিও বনু যোহরা গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী ও বাহাদুর ছিলেন। তাঁর হাতেই হযরত উমর (রা.)'র যুগে ইরাক বিজয় হয়। আমীর মুয়াবিয়ার যুগে তাঁর মৃত্যু হয়।

চতুর্থজন হলেন, যুবায়ের বিনু আওয়াম (রা.)। তিনি মহানবী (সা.)-এর ফুফাতো ভাই ছিলেন, অর্থাৎ আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা সুফিয়ার পুত্র ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি হযরত আবু বকর (রা.)'র জামাতা হওয়ারও সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি বনু আসাদ গোত্রের সদস্য ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৫ বছর। পরিখার যুদ্ধের সময় একটি বিশেষ দায়িত্ব পালনের কারণে মহানবী (সা.) যুবায়ের (রা.)-কে হাওয়ারী উপাধিতে ভূষিত করেন। হযরত আলী (রা.)'র খিলাফতকালে 'জঙ্গে জামাল' বা 'উটের যুদ্ধে' যুবায়ের (রা.)শাহাদত বরণ করেন।

পঞ্চম ব্যক্তি হলেন, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.)। তিনি হযরত আবু বকর (রা.)'র বংশ, অর্থাৎ বনু তায়েম গোত্রের সদস্য ছিলেন। সেই যুগে তিনিও টগবগে তরুণ ছিলেন। হযরত তালহা (রা.)ও ইসলামের বিশেষ নিবেদিতপ্রাণ লোকদের একজন ছিলেন। হযরত আলী (রা.)'র খিলাফতকালে 'জঙ্গে জামাল' বা 'উটের যুদ্ধে' তিনি শহীদ হন।

এই পাঁচজন সাহাবীই 'আশারায়ে মুবাশ্বারা'র- অর্ন্তগত। অর্থাৎ সেই দশজন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে মহানবী (সা.) তাঁর পবিত্র ভাষায় বিশেষভাবে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তাঁরা মহানবী (সা.)-এর অত্যন্ত নৈকট্যপ্রাপ্ত সাহাবী এবং উপদেষ্টা গণ্য হতেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ১২২-১২৩)

মক্কার কাফিররা ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপর বিভিন্ন ধরণের অত্যাচার ও নিপীড়ন চালিয়েছে। শুধু মাত্র দুর্বল ও দাস শ্রেণির মুসলমানরাই যে তাদের অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হয়েছেন তা নয় বরং স্বয়ং মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)ও মক্কার মুশরিকদের নিপীড়ন ও নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পান নি। ইতিহাস এর সাক্ষী যে, তাঁদেরকেও, অর্থাৎ মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)-কেও বিভিন্ন ধরণের অত্যাচার ও নিপীড়নের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করা হয়েছে। সীরাতে হালাবিয়াতে একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে আর সেটি হলো, হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত তালহা (রা.) যখন তাঁদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেন তখন নওফেল বিন আদাভিয়া তাঁদের উভয়কে পাকড়াও করে। এই লোককে কুরাইশদের বাঘ বলা হত। সে তাঁদের দু 'জনকে একই রশি দিয়ে বেঁধে ফেলে। তাঁদের গোত্র বনু তায়েমও তাঁদেরকে বাঁচাতে এগিয়ে আসে নি। এজন্য হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত তালহা (রা.)-কে কারীনায়েন-ও বলা হয় অর্থাৎ, একসূত্রে গ্রথিত দু 'সাথী। নওফেল বিন আদাভিয়া'র শক্তি ও তার অত্যাচারের কারণে মহানবী (সা.) বলতেন, আল্লাহুম্মাকফিনা শার্‌রাবনিল আদাভিয়া অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! ইবনে আদাভিয়া'র অনিষ্টের বিপরীতে তুমি আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাও।

(আস সীরাতুল হালবিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৫)

উরওয়া বিন যুবায়ের বর্ণ না করেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন আ'স (রা.)-কে জিজ্ঞেস করি, আপনি আমাকে সেই বর্ব র আচরণের কথা বলুন যা মুশরিকরা মহানবী (সা.)-এর সাথে করেছিল। তিনি বলেন, একবার মহানবী (সা.) মসজিদে হারামের অঙ্গনে নামায আদায় করছিলেন, তখন উকবা বিন আবী মু'ঈদ আসে এবং তাঁর (সা.) ঘাড়ে কাপড় পেঁচিয়ে জোরে গলা চেপে ধরে। ইত্যবসরে হযরত আবু বকর (রা.) সেখানে পৌঁছে যান এবং উকবার ঘাড় ধরে ধাক্কা দিয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে তাকে সরিয়ে দিয়ে বলেন, أَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا أَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللهُ অর্থাৎ, তোমরা কি একারণে এক ব্যক্তিকে হত্যা করছ যে বলে আল্লাহ্ আমার প্রভু? (সূরা মোমেন: ২৯) (সহী বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৮৫৬)

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, একবার মুশরিকরা মহানবী (সা.)-কে বলে, তুমি কি আমাদের উপাস্য সম্পর্কে একথা বলো নি? মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ। পরক্ষণে তারা তাঁর চতুর্দি কে সমবেত হয়। সেসময় কেউ একজন হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলে, নিজের বন্ধুর খবর নাও। হযরত আবু বকর (রা.) বের হন এবং মসজিদে হারামে পৌঁছেন। তিনি গিয়ে দেখেন, লোকেরা একত্রিত হয়ে মহানবী (সা.)-কে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তোমরা ধ্বংস হও!

أَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا أَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ (সূরা আল্ মো'মেন: ২৯)। অর্থাৎ, তোমরা কি কেবল একারণে এক ব্যক্তিকে হত্যা করবে যে, সে বলে আল্লাহ্ আমার প্রভু এবং সে তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভু - প্রতিপালকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছে? এরপর তারা মহানবী (সা.)-কে ছেড়ে দেয় এবং হযরত আবু বকর (রা.)'র ওপর হামলে পড়ে এবং তাঁকে মারতে থাকে। হযরত আবু বকর (রা.)'র মেয়ে আসমা বলেন, তিনি আমাদের নিকট এমন অবস্থায় আসেন যে, তিনি তঁার চুলে হাত দিলে সেগুলো হাতে উঠে আসতো। আর তিনি বলেন, تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ। অর্থাৎ, হে মহাপ্রতাপশালী এবং মহা সম্মানের অধিকারী! তুমি আশিসমণ্ডিত।

একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, তারা মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মাথা এবং দাড়ি মোবারক ধরে এত জোরে টেনেছিল যে, তাঁর (সা.) অধিকাংশ চুল উঠে যায়। তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে (সা.) বাঁচানোর জন্য চলে আসেন আর তিনি বলছিলেন,

أَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا أَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ (সূরা আল্ মো'মেন: ২৯)। অর্থাৎ, তোমরা কি কেবল এ কারণে এক ব্যক্তিকে হত্যা করবে যে, সে বলে আল্লাহ্ আমার প্রভু? তোমরা কি এই ব্যক্তিকে কেবল এজন্য হত্যা করতে চাও যে, সে বলে আল্লাহ্ আমার প্রভু? একইসাথে হযরত আবু বকর (রা.) কাঁদছিলেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু বকর! তাদেরকে

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 20 Jan, 2022 Issue No.3

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

ছেড়ে দাও। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি তাদের প্র তি প্রেরিত হয়েছি যাতে আমি উৎসর্গিত হয়ে যাই। এরপর তারা অর্থাৎ কাফিররা মহানবী (সা.)-কে ছেড়ে দেয়। (আসসীরাতুল হালবিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪১৭)

হযরত আলী (রা.) একবার লোকদের জিজ্ঞেস করেন, হে লোকসকল! লোকদের মাঝে সর্বাধিক সাহসী কে? লোকেরা উত্তরে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি। হযরত আলী (রা.) বলেন, আমার বিষয়টি হলো, যে আমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে তার প্রতি আমি সুবিচার করেছি অর্থাৎ, তাকে মেরে ধরাশায়ী করেছি। কিন্তু সত্য কথা হলো, সর্বাধিক সাহসী ব্যক্তি হলেন হযরত আবু বকর (রা.)।

আমরা বদরের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর জন্য তাঁবু খাঁটাই। অতঃপর আমরা বলি, কে আছে যে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে থাকবে যেন তাঁর (সা.) নিকট কোন মুশরিক পৌঁছুতে না পারে? অতএব, আল্লাহ্‌র কসম! মহানবী (সা.)-এর নিকট কেউ গেল না, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) স্বীয় তরবারি হাতে নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট দণ্ডায়মান হন অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর নিকট কোন মুশরিক আসতে পারবে না যতক্ষণ না তার সাথে সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর (রা.)-এর মোকাবিলা হয়। কাজেই, তিনিই সর্বাধিক সাহসী ব্যক্তি।

একবারের ঘটনা, হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি দেখি, কুরাইশরা মহানবী (সা.)-কে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। কেউ তঁ ার (সা.) প্রতি ক্রোধ ও ক্ষোভ প্রকাশ করছিল, কেউবা তাঁকে উত্যক্ত করছিল আর বলছিল, তুমি সকল উপাস্যকে এক উপাস্য বানিয়ে বসেছ। আল্লাহ্‌র কসম! যে-ই মহানবী (সা.)-এর কাছে আসত তাদের কাউকে আবু বকর (রা.) মেরে প্রতিহত করতেন, কাউকে শক্ত কথার মাধ্যমে প্রতিহত করতেন আর বলতেন, তোমরা ধ্বংস হও। أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ (সূরা আল্ মো'মেন: ২৯)। অর্থাৎ, তোমরা কি কেবল এ কারণে এই ব্যক্তিকে হত্যা করবে যে, সে বলে আল্লাহ্ আমার প্রভু -প্রতিপালক? অতএব, হযরত আলী (রা.) নিজের চাদর সরিয়ে এতটা কাঁদেন যে, তঁ ার দাড়ি অশ্রুশিক্ত হয়ে যায়। পুনরায় বলেন, আমি তোমাদের আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি! ফিরাউনের জাতির মু 'মিন উত্তম ছিল নাকি হযরত আবু বকর (রা.)? সম্ভবত হযরত আলী (রা.)'র ফিরাউনের জাতির মু 'মিনের কথা উল্লেখ করার কারণ হলো, পবিত্র কুরআনে ফিরাউনের জাতির সেই ব্যক্তির সাথে এ আয়াত সম্পৃক্ত যে নিজের ঈমান গোপন করেছিলেন আর তিনি ফিরাউনের দরবারে এই কথা বলছিলেন যে, أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ (সূরা আল্ মো'মেন: ২৯)। একথা শোনার পর উপস্থিত সবাই নীরব হয়ে যায়। হযরত আলী (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! হযরত আবু বকর (রা.)'র এক মুহূর্ত ফিরাউনের জাতির মু'মিনের সারা জীবনের পুণ্যের চেয়ে উত্তম। কেননা সে নিজ ঈমানকে গোপন করেছিল আর এই ব্যক্তি অর্থাৎ, হযরত আবু বকর (রা.) নিজ ঈমানের ঘোষণা দিয়েছিলেন।

(আবু বাকার সিদ্দিক, শাখসিয়্যাতুহু ওয়া আসরুহু, প্রণেতা- দাক্তুর আলি মহম্মদ আস সালাবী, পৃ:৩৮)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমরা যখন মহানবী (সা.)-এর জীবনের ঘটনাবলীর প্রতি লক্ষ্য করি, এই দাবির সত্যতা আমাদের দৃষ্টিপটে আসে এবং আমরা পদে পদে এমন ঘটনা দেখতে পাই যা মানবজাতির প্রতি তাঁর সীমাহীন ভালোবাসা এবং স্নেহের প্রমাণ বহন করে। যেমন, এক আল্লাহ্‌র বাণী পেঁ ছানোর জন্য বছরের পর বছর তাঁকে এমন কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে যে, যার কোন সীমা পরিসীমা নেই।একবার কা'বার প্রান্তরে কাফিররা তঁ ার গলায় রশি পেঁ চিয়ে এত জোড়ে টানছিল যে, তার চোখ রক্তবর্ণ হয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসে। হযরত আবু বকর (রা.) একথা শুনেই ছুটে আসেন আর মহানবী (সা.)-কে এই কষ্টের মাঝে দেখে তঁ ার চোখে পানি এসে যায় আর তিনি কাফিরদের দূরে সরিয়ে দিয়ে বলেন, আল্লাহ্‌কে ভয় করো। তোমরা কি এই ব্যক্তিকে কেবল এজন্য নির্যাতন করছ যে, সে বলে, আল্লাহ্ আমার প্রভু প্রতিপালক?"

(তফসীরে কবীর, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৬৩-৬৪)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "একবার একদল শত্রু মহানবী (সা.)-কে একাকী পেয়ে ঘিরে ধরে এবং তঁ ার গলায় রশি পেঁ চিয়ে তা টানতে থাকে। যার দরুন তঁ ার (সা.) প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। দৈবক্রমে হযরত আবু বকর (রা.) সেখানে আসেন আর তিনি তঁ াকে অনেক কষ্টে মুক্ত করেন। এরপর তারা আবু বকর (রা.)-কে এত বেশি প্রহার যে,তিনি অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।"

(চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ২৫৭-২৫৮)

ক্রীতদাসদের মুক্ত করার ব্যাপারে হযরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। বর্ণিত আছে, হযরত আবু বকর (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর কাছে চল্লিশ হাজার দিরহাম ছিল। তিনি এই সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করেন এবং সেই সাত ব্যক্তিকে মুক্ত করেন যাদের আল্লাহ্‌র কারণে কষ্ট দেওয়া হত। তিনি হযরত বিলাল (রা.), আমের বিন ফুহাইরা (রা.), যিন্নিরাহ্ (রা.), নাহদীয়া (রা.) এবং তঁ ার মেয়ে বানি মোমেল এর দাসী এবং উম্মে উবায়েসকে মুক্ত করেন।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪৭)

হযরত বিলাল (রা.) বনু জুমাহ্'র ক্রীতদাস ছিলেন আর উমাইয়া বিন খালফ তাঁকে চরম কষ্ট দিতো।

(উসদুল গাবা ফি তামিযিস সাহাবা,১ম খণ্ড, পৃ: ২৮৩)

একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, যখন হযরত বিলাল (রা.) ঈমান আনেন তখন তঁ াকে তাঁর মালিক ধরে মাটিতে শুইয়ে দেয় এবং তাঁর ওপর পাথরের টুকরো এবং গরুর চামড়া চাপিয়ে দেয় এবং বলে, লাত এবং উযযা তোমার প্রভু কিন্তু তিনি "আহাদ" "আহাদ"উচ্চারণ করতে থাকতেন। হযরত আবু বকর (রা.) তঁ ার নিকট আসেন ও কাফিরদের বলেন, তোমরা আর কতদিন এই ব্যক্তিকে কষ্টে জর্জরিত করতে থাকবে? বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) ৭ অওকিয়ার বিনিময়ে হযরত বেলাল (রা.)-কে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। অর্থাৎ, যেহেতু ১ অওকিয়া সমান ৪০ দিরহাম। সে অনুযায়ী ২৮০ দিরহামের বিনিময়ে তাঁকে ক্রয় করেছিলেন। অতঃপর হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে এ ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি (সা.) বলেন, হে আবু বকর! আমাকেও এতে অংশীদার করে নাও। হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি তাকে মুক্ত করে দিয়েছি। (আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮২)

হযরত আমের বিন ফুহায়রাহ্ (রা.) একজন কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি তোফায়েল বিন আব্দুল্লাহ্ বিন সাখবারাহ্'র ক্রীতদাস ছিলেন, যে মাতৃ সম্পর্কের দিক থেকে হযরত আয়েশা (রা.)'র ভাই ছিলেন। হযরত আমের (রা.) সর্বাগ্রে ইসলামগ্রহণকারীদের একজন ছিলেন। তঁ াকে আল্লাহর রাস্তায় অনেক কষ্ট দেয়া হয়েছে। হ যরত আবু বকর (রা.) তাঁকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। (উসদুল গাবাহ ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১)

হযরত যিন্নিরাহ্ রুমী (রা.), প্রাথমিক যুগে ইসলামগ্রহণকারী মহিলাদের অন্যতম ছিলেন। তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ইসলামধর্মে যোগ দিয়েছিলেন। মুশরিকরা তাঁকে অনেক কষ্ট দিত। বলা হয়, তিনি বনু মাখযুম গোত্রের দাসী ছিলেন এবং আবু জাহল তাঁকে অনেক অত্যাচার করত। এটিও বলা হয়ে থাকে, তিনি বনু আব্দুদ্ দ্বারের দাসী ছিলেন। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তঁ ার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যায়। এ কারণে মুশরিকরা বলে, লাত ও উয্যাকে অস্বীকার করার দরুণ তারা যিন্নিরাহ্'র দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিয়েছে। একথা শুনে হযরত যিন্নিরাহ্ (রা.) বলেন, লাত ও উয্যা তো এটিও জানে না যে, কে তাদের উভয়েরউপাসনা করে। তারা নিজেরাই তো অন্ধ, আমাকে কি অন্ধ করবে? এটি তো ঐশী তকদীর। খোদা তা'লার অভিপ্রায় এটি যে, আমার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গেছে আর আমার খোদা আমাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়ার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন; তিনি কাফিরদের এই উত্তর দেন। এ অবস্থায়ই সেই রাত অতিক্রান্ত হয়। পরেরদিন সকালে তিনি জাগ্রত হয়ে দেখেন, আল্লাহ তা'লা তাঁকে তঁ ার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি সবকিছু দেখতে পাচ্ছেন। এটি দেখে কুরাইশরা বলে, মুহাম্মদের জাদুবলে এটি সম্ভব হয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর প্রতি নির্যাতনের দৃশ্য দেখে তাঁকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন।

((উসদুল গাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১২৭)

এই স্মৃতিচারণ আগামীতেও অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। ক্রীতদাস মুক্তির আরো কিছু ঘটনা রয়েছে।

****

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir